

শাশ্বত সত্য

~ত্রৈমাসিক~

১ম বর্ষ • ২০২৫ | ৩য় সংখ্যা • ১৪৩২

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর

শাশ্বত সত্য

১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয় | অভিমত



যখনই আমি *'শাশ্বত সত্য'* পত্রিকায় কাজ করি তখনই আমার মনে অন্যরকম আনন্দ অনুভূত হয়। পরমেশ্বর মহাদেবের আশীর্বাদে সত্য প্রকাশের ধারাবাহিকতায় তৃতীয় সংখ্যাও প্রকাশিত হল।

পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীতে থাকা লোকজনের ও আপনাদের সমর্থনে আমরা এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সাহস পাচ্ছি। যদিও এসএসএস' ছোট প্ল্যাটফর্ম বিধায় আমাদের কার্যক্রমগুলো আশানুরূপভাবে লোকজনের কাছে পৌঁছতে পারছে না তথাপি অল্প সংখ্যক লোকজনের উৎসাহ, উদ্দীপনাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আধুনিকায়ন আমাদের জন্য যেমন আশীর্বাদ স্বরূপ তেমনি অভিশাপ হয়েও নেমে এসেছে। আজকাল কেউ আর ঐরকম জ্ঞানের চর্চা করে না, যে যা লিখে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ছেড়ে দেয় তাই অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস করে। পত্রিকাটির গত সংখ্যা আমরা কিছু জ্ঞানী গুণী বা সুবিবেচকদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। গুটি কয়েক ব্যক্তি পত্রিকাটিকে তথ্যবহুল বলে মত জানিয়েছেন এবং নিজে থেকেই তৃতীয় সংখ্যা পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এটা সত্যিই আমার জন্য একটি অন্যতম প্রাপ্তি। এটা যেহেতু কলি যুগ তাই সত্যের পক্ষে লোকজন কম থাকবে, সত্য জানার জন্য এক পলকের সময়কেও সময় নষ্ট মনে করবে আবার অনেকে আমাদের কার্য নিয়ে হিংসাও করবে; তবে সম্পাদক হিসেবে মা সরস্বতীর কৃপায় আমাদের কাজ চলমান থাকবে বলেই আশান্বিত।

আজকাল অনেক অনেক ধর্ম সম্পর্কিত পত্রিকা ও বিভিন্ন ধরনের লেখা পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে পত্রিকা প্রকাশ একপ্রকার প্রতিযোগিতার সামিল। আমরা এই প্রতিযোগিতার যুগে সত্যকে তুলে ধরার ক্ষুদ্র চেষ্টা করছি মাত্র। পত্রিকায় প্রকাশিত সকল প্রবন্ধ পড়ুন, পরিচিতদের পড়তে দিন এবং নিজেরাই ভাল মন্দ যাচাই করুন। আমাদের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিতে পারেন বা পরামর্শ দিতে পারেন। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য সহায়ক হবে।

সত্যমেব জয়তে....

মৃগাঙ্ক রায়

সম্পাদক, শাশ্বত সত্য

গবেষক, সনাতন শাস্ত্র গবেষণা কমিটি

সত্যের সন্ধানে সনাতন

সম্পাদকীয় | অভিমত



সবার উপর বসে আছেন এক মহাজ্ঞানী। আর সেই মহাজ্ঞানীকে জানতে হলে প্রয়োজন সত্যকে উপলব্ধি করা। সনাতন যা চিরন্তন ছুটে চলেছে কিন্তু আমরা তাহাকে ধরতে পারিনা বলে যতটুকু ধরতে পারি সেটাকেই সত্য মনে করি কিন্তু বাস্তবে সেটা সত্য নয় আবার মিথ্যাও নয়। অর্ধসত্য যা দ্বারা সত্যকে সম্পূর্ণ বিচার করা যায়না। সেই সত্যকে উপস্থাপন করার জন্যই আমাদের ছোট একটি উদ্যোগ। আপনাদের আর্শীবাদ ও প্রার্থনাই, সম্পাদকমণ্ডলী ও উপদেষ্টাগণ, এসএসএস' এর সকল সক্রিয় সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে প্রথম বর্ষের দুই সংখ্যার পর সেই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো। যত ভালো ও সত্য লেখাই হোক না কেন, একটি পত্রিকা তখনই সার্থক হয় যখন সেটা পড়ে পাঠকের সন্তুষ্টি হয়, অন্যথা সেটা বৃথা। এই পত্রিকা নিয়ে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই, সেটা পাঠকরাই বিচার করবেন। 'শাশ্বত সত্য' সত্যের সন্ধানে সনাতন এর এক মহৎ উদ্যোগ আর সেই মহৎ উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের সকলের। এই পত্রিকা সম্পর্কে যেকোনো মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ সর্বদা গ্রহণীয়।
জয় সনাতনের জয়
নমস্কার সকলকে🙏

নিরঞ্জন চন্দ্র দাস

উপদেষ্টা, শাশ্বত সত্য

সম্পাদক মন্ডলী, উপদেষ্টা মন্ডলী, পত্রিকা কমিটির সকল সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সকল শুভাকাঙ্খীদের প্রার্থনা, আশীর্বাদ ও সহযোগিতায় প্রকাশিত হলো "শাশ্বত সত্য" পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা। বর্তমান সময়ে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা, ভুল উপস্থাপনার কারণে মানুষ বিভ্রান্ত, সেখানে আমাদের শাশ্বত সত্যে'র একমাত্র লক্ষ্য মানুষের কাছে জ্ঞান জ্যোতি পৌঁছে দেওয়া। আমাদের এবারের সংখ্যায় থাকছে ধর্ম ও ধর্ম সম্পর্কিত ইতিহাস বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ, শিশুতোষ কবিতা যা পাঠকগণের মনের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলন করবে বলেই আশান্বিত। আপনাদের পরামর্শ, মতামত আমাদের কার্যের উৎসাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। অতএব, বিনীত নিবেদন, আপনাদের মূল্যবান মতামত এবং পত্রিকার উন্নতির জন্য পরামর্শ প্রদান করে আমাদের কার্যে সহায়তা করবেন।
জয় সনাতন 🙏🏻

স্নেহা গাইন

প্রচারক, শাশ্বত সত্য

সূ চি প ত্র

১ম বর্ষ • ৩য় সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর

২০২৫ ইং | ১৪৩২ বং



অদ্বৈতবেদান্ত অনুযায়ী ‘মায়া’

বৃহদ্রথ সান্যাল

অদ্বৈতবেদান্ত নিয়ে আলোচনা হলে মায়া সম্পর্কিত কিছু ভ্রান্ত ধারণা উপস্থাপিত হয়। এই মায়া মানে দেবী মহামায়া বা শক্তি নন, এই মায়া দ্বারা ব্রহ্মের একটি শক্তিকে বুঝানো হয়। কারণ অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী ব্রহ্মের সাকার ঈশ্বর রূপ হিসেবে শিব, বিষ্ণু, শক্তি, সূর্য ও গণেশকে বিবেচনা করা হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টির নিমিত্তে নিজের শক্তি মায়া দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন ও সগুণ হন এবং মায়াময় ব্রহ্মই ঈশ্বর। শ্রুতিতে রয়েছে -

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্ত মহেশ্বরম্।
তস্যাবেয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ।।

(কৃষ্ণ যজুর্বেদ - শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ - ৪/১০)

অনুবাদ: পূর্বে (শ্বে. উ. ১/৩, ১/৯-১০) যাহাকে জগতের প্রকৃতি বা উপাদান বলা হইয়াছে, সেই প্রকৃতিকেই মায়া বলিয়া জানিবে, এবং মহেশ্বরকে অর্থাৎ জগৎ-স্রষ্টাকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে। ইহারই (জগৎ স্রষ্টা) অবয়বভূত অর্থাৎ অবয়বরূপে কল্পিত বস্তু সমূহের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত অর্থাৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

এই মন্ত্রের শঙ্কর ভাষ্যে বিষয়টি আরো সুন্দর করে বুঝাতে বলা হয়েছে - '....মহেশ্বরস্তং মায়িনং মায়েয়োঃ সত্তাস্ফূর্ত্যাদিপ্রদতয়া অধিষ্ঠানত্বেন প্রেরয়িতারমেব....' এর অর্থ - 'যিনি মহান ঈশ্বর (শাসন শক্তিসম্পন্ন), তিনি মহেশ্বর, তাঁহাকে মায়ী অর্থাৎ মায়ার সত্তা ও প্রকাশ সম্পাদক এবং আশ্রয়প্রদরূপে প্রেরক বলিলাও জানিবে।' তাহলে এটা স্পষ্ট হলো যে মায়া আর ঈশ্বর এক নয়। নির্গুণ ও সগুণ (ঈশ্বর) ব্রহ্ম, ভিন্ন তত্ত্ব নয়। ব্রহ্মের সগুণভাব লীলা মাত্র। ব্রহ্ম মায়া যুক্ত হয়ে ঈশ্বর হন, জগৎ সৃষ্টির উপাদান কারণ প্রকৃতির প্রকাশও এই মায়া দ্বারাই ঈশ্বর করে থাকেন। তবে মায়ার অধীন না থেকেই তিনি কার্যগুলো করে থাকেন। প্রকৃতিকেও মায়া বলা হয়েছে তাই প্রকৃতির তিন গুণের কারণে মায়াকে সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী বলা হয়। পরমেশ্বর যেহেতু মায়ার অধীন নন তাই উনাকে

মায়ার অধীশ তথা মায়াধীশ বলা হয় এবং জীব মায়ার বশে বিধায় জীবকে অনীশ বলা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪/১২ এ রয়েছে - 'অন্য যে সকল শম-দমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষ দর্পাদি রাজস ভাব ও শোকমোহাদি তামস ভাব প্রাণিগণের নিজ নিজ কর্মবশে জন্মিয়া থাকে, সেই সমস্তই আমার প্রকৃতির গুণের কার্য্যহেতু আমা হইতেই জাত বলিয়া জানিবে। এইরূপ হইলেও তাহাদিগতে আমি নাই অর্থাৎ জীবগণের ন্যায় আমি তাহাদের অধীন নহি; কিন্তু সেইগুলি আমার অধীনভাবে আমাতে বিদ্যমান থাকে।'

অতএব মহামায়া বা শক্তি, অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী সগুণ ঈশ্বর কিন্তু মায়া নয়, মায়া ঈশ্বরের অধীনে ঈশ্বরের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। অদ্বৈতবাদে একমাত্র ব্রহ্মের সত্তাকেই সত্য বলা হয়েছে এবং বাকি সব মায়া মাত্র, শ্রুতি বলছে - '....আত্মা অদ্বিতীয়, আত্মার যে দ্বৈত প্রতিভাস হয়, মায়াই তাহার কারণ।....'(অথর্ববেদ - নৃসিংহতাপনী উপনিষদ - উত্তরভাগ - ৯/১, খণ্ডাংশ)

মায়ার স্বরূপ বর্ণনায় শ্রীমদ্বিষ্ণুভাগবত মহাপুরাণ বলছে -

'হে ব্রহ্মন্! আমার মায়া স্বরূপ এই, যে বস্তু কোন অর্থ ব্যতিরেকে প্রতীয়মান হয় এবং সৎ হইলেও যাহা আত্মাতে প্রতীয়মান হয় না তাহাই আমার মায়া, অর্থাৎ দুই চন্দ্র ইত্যাদি যেমন অর্থ বিনা প্রতীত মাত্র হয় তাহার ন্যায় অর্থ শূন্য হইয়া মায়া কখন২ প্রতীত হয়, আর যেমন অন্ধকার বস্তুতঃ একটা পদার্থ হইলেও প্রকাশ পায় না তাহার ন্যায় মায়ারও কখনো আত্মাতে প্রকাশ হয় না।' (শ্রীমদ্বিষ্ণুভাগবত - ২/৯/৩৩, শ্রীধর টীকা)

আবার উপরে বর্ণিত বিষয়ের সমর্থনে গৌড়পাদ কৃত মাণ্ডুক্য কারিকা ৪/৫৮ এর শঙ্কর ভাষ্যে রয়েছে -

...**মায়া ইতি অবিদ্যমানস্য আখ্যা ইত্যভিপ্রায়ঃ।।** (শেষাংশ)

অর্থ: অভিপ্রায় এই যে, যাহা বিদ্যমান নাই তাহা বলিতে হইলে মায়া' এই নামপ্রদত্ব হইয়া থাকে।

ব্রহ্মসূত্র ১/৪/৩ এর শঙ্করভাষ্যে মায়া - অজ্ঞান, অবিদ্যা, অব্যক্ত, প্রকৃতি, আকাশ, অক্ষর, বীজশক্তি ইত্যাদি শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। কারণ শুক্ল যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩/৮/১১ এ রয়েছে - "...**এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ**" (খণ্ডাংশ) অর্থাৎ, 'হে গার্গি! এই অক্ষর ব্রহ্মেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে।' এবং অথর্ববেদীয় মুণ্ডক উপনিষদ ২/১/২ এ রয়েছে - "...**অক্ষরাৎ্পরতঃ পরঃ**" (খণ্ডাংশ) অর্থাৎ, 'তিনি স্বীয় নিরুপাধিক স্বরূপে শ্রেষ্ঠ অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ।' মায়ার প্রকৃতিস্বরূপ অর্থের প্রমাণ উপরে দেওয়া হয়েছে। মায়া ও অবিদ্যা আদিগুরু শঙ্করাচার্যের মতে মূলত অভিন্ন। মায়া তিন গুণময়ী (উপরে বর্ণিত হয়েছে) বিধায় অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে অদ্বৈত বেদান্তের মতে বিদ্যা বা জ্ঞানের অভাব বলা যায় না, এটি ভাবস্বরূপ ও বস্তুভূত। মায়াই এই জগৎ সংসারের মূল কারণ, জগতের বীজশক্তি সুতরাং, একে অসৎ বলা যায় কিভাবে? তবে মায়া বা অবিদ্যা যেমন অসৎ নয় তেমনি সৎও নয়। কারণ, যা সৎ তা চিরকালই ছিল, আছে ও থাকবে কিন্তু মায়া দ্বারা সৃষ্ট জগৎ সবসময় একরকম থাকে না। বিদ্যার উদয় হলে অবিদ্যা নাশ হয়। অবিদ্যার প্রতীতিকালে এটি সত্য বলেই মনে হয়, তাই এটি আংশিক সৎ আবার বিনষ্ট হয়ে যায় বিধায় এটি আংশিক অসৎ। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের অদ্বৈতবাদ' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় - "জগৎ, আছে বলিয়া দেখা যায়-এরূপ নহে, কিন্তু দেখা যায় বলিয়া 'আছে' বলা হয় মাত্র। যেমন রজ্জুসর্পকে দেখা যায় বলিয়া 'আছে' বলা হয়, কিন্তু রজ্জুসর্প থাকায় 'আছে' বলিয়া জ্ঞান হয় না। এই সত্তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলা হয়, জগতের সত্তাও এইরূপই বটে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিশেষ থাকায় জগতের সত্তাকে ব্যবহারিক সত্তা বলা হয়।"

সম্পূর্ণ সৎও নয় ও অসৎও নয় (বা আংশিক সৎ ও আংশিক অসৎ) বিধায় মায়াকে অদ্বৈতবাদে 'অনির্ব্বচনীয়' বলা হয়। বিদ্যারণ্য স্বামী মায়ার স্বরূপ নিরূপিত করতে বলেছেন -

ইত্থং লৌকিকদৃষ্ট্যৈতৎ সর্বৈরপ্যনুভূয়তে।
যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্বাচ্যং নাসদাসীদিতি শ্রুতেঃ।।
(পঞ্চদশী - ৬/১২৮)

অনুবাদ: এইরূপ লৌকিকদৃষ্টিতে মায়ার এই জড় ও মোহরূপ তমোরূপতাকে সকলেই অনুভব করে। কিন্তু যুক্তি দিয়া দেখিলে, মায়ার এই তমোরূপতা অনির্বচনীয় অর্থাৎ ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। 'অসৎ ছিলনা'-ইত্যাদি শ্রুতি (ঋগ্বেদ ১০/১২৯ নং সূক্ত-নাসদীয়সূক্ত দ্রষ্টব্য) তাহার প্রমাণ।

মায়ার বিষয়ে বিদ্যারণ্য স্বামী আরো বলেছেন - 'সেই মায়াকে তিনপ্রকার দৃষ্টিতে তিনভাবে বুঝা যায়-শ্রৌত-দৃষ্টিতে তাহা তুচ্ছা, যুক্তির দৃষ্টিতে অনির্বচনীয়া এবং লৌকিক-দৃষ্টিতে বাস্তব।' (পঞ্চদশী ৬/১৩০)

যেহেতু কোন বস্তু আলো ও অন্ধকারের ন্যায় বিরূদ্ধ স্বভাবযুক্ত হতে পারে না, আর বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত বস্তু কারোর

বুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না। একারণেই মায়া ও তার কার্য্য জগৎকে অদ্বৈতবেদান্তে 'মিথ্যা' বলা হয়। অর্থাৎ, সৎ ও অসৎ নয় এরূপ বিষয়কেই অদ্বৈতবাদে 'মিথ্যা' বলা হচ্ছে। 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' - বিবেকচূড়ামণি, ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা ইত্যাদি গ্রন্থে এইরকম শ্রুতিবচনের (শুক্ল যজুর্বেদ, নিরালম্ব উপনিষদ) উল্লেখ দ্বারা আদিগুরু মায়ার কার্য এই জগৎকে মিথ্যা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। আদিগুরু আরও বলছেন - 'রাগ ও দ্বেষাদিযুক্ত এই সংসার স্বপ্নতুল্য, যেমন স্বপ্নসময়ে দৃশ্যমান বস্তু সত্য বলিয়া বোধ হয়, জাগ্রতকালে মিথ্যা বলিয়া জানা যায়, সেইরূপ যতকাল অজ্ঞান থাকে, ততকাল জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে জগতের মিথ্যাত্বই জ্ঞাত হওয়া যায়। যতকাল সকলের অধিষ্ঠানরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞান না হয়, তাবৎকাল শুক্তিকাতে (ঝিনুকে) রৌপ্যের ন্যায় জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়।' (আত্মবোধ - ৬, ৭)

তবে উল্লেখিত 'মিথ্যা' শব্দ দ্বারা বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় অলীক বা অসম্ভব বুঝাচ্ছে না। ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে রয়েছে, '...অধ্যাসো ভবিতুং যুক্তম্...' অর্থাৎ, অধ্যাস মিথ্যা হইবার যোগ্য। এর ব্যাখ্যায় পদ্মপাদাচার্য পঞ্চপাদিকায় বলেছেন - 'অধ্যাস মানে হলো অন্য কোন কিছুর প্রকৃতির প্রকাশ, যা ঐ প্রকৃতির নয়। যুক্তিসঙ্গতভাবে, এটি মিথ্যা (মিথ্যা)। 'মিথ্যা' শব্দটির দুটো অর্থ রয়েছে - এটি অসম্ভব অর্থ বুঝানোর পাশাপাশি অনির্বাচনীয়তা অর্থও নির্দেশ করে। এখানে এটি অনির্বচনীয়তা প্রকাশ করছে।' অনির্বচনীয় বিষয় মানেই মিথ্যা তথা মায়া আর আর মায়ার কার্যই জগৎ। মায়া বিষয়ক এরকম বহু প্রমাণ শ্রুতিতে বারবারই বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে -

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ।।

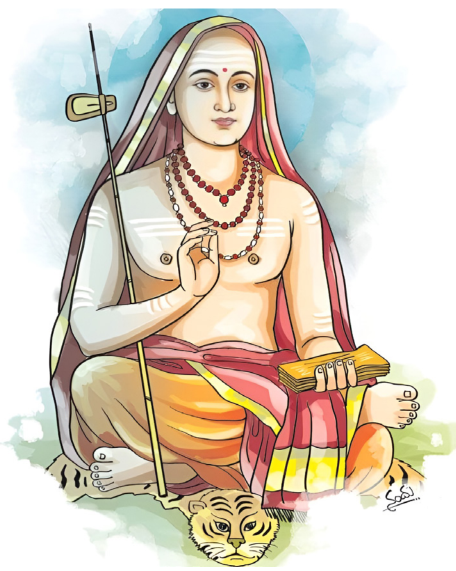
(কৃষ্ণযজুর্বেদ - শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ - ১/৯)

অনুবাদ: সেই পরমেশ্বরই সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ এবং সকলের প্রভু ও অপ্রভু-এই উভয় রূপ অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের রূপ ধারণ করিয়াছেন। একমাত্র অনাদি প্রকৃতি বা মায়া ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্যবস্তু সম্পাদনে নিযুক্তা। পরমাত্মা অনন্ত ও সর্বস্বরূপ অতএব তিনি কর্তৃত্বহীন। সাধক যখন এই তিনটিকে অর্থাৎ ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগকে অথবা জীব, ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপে জানেন তখন তিনি পাশমুক্ত হন।

বিষয়টি সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য আরেকটি শ্রুতি বচন দেওয়া হলো -

'...জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি।' (অথর্ববেদ - নৃসিংহতাপনী উপনিষদ - উত্তরভাগ - ৯/৫, খণ্ডাংশ)

অনুবাদ: যাঁহারা অবিদ্যায় (বৃদ্ধিতে) প্রতিবিম্বিত চৈতন্যে অভেদজ্ঞানে (বুদ্ধিতে) তাহাতে অহংভাব পোষণ করেন, তাঁহারাই জীবপদবাচ্য। কিন্তু যিনি ঐ চিদাভাসের সাক্ষিভাবে অবস্থিত, নিরহঙ্কার, কেবল, অয়স্কান্ত-সান্নিধ্যে লৌহবৎ স্বসত্তামাত্রে সমস্ত জগৎ প্রবর্তিত করেন, তিনিই ঈশ্বর। অথবা মায়ার বিচিত্র কার্য্যভেদের নিয়ামকরূপের আভাস দ্বারা ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই রূপাভিমানী চিদাভাস ঈশ্বরস্বরূপ হয়। পরন্তু বিশেষ এই, আভাস প্রাধান্যেই অনেক জীবত্ব সিদ্ধ, ইহাই জীবেশ্বরভাব।....



অতএব, এখানে মায়ার দুটো শক্তি লক্ষিত হচ্ছে। জীবে 'অবিদ্যা' রূপ শক্তি এবং ঈশ্বরে 'মায়া' রূপ শক্তি। এই দুই শক্তি আদিগুরু বিক্ষেপ ও আবরণ শক্তি হিসেবে বর্ণিত করেছেন, 'মায়ার দুইটি শক্তি, তন্মধ্যে একটা **বিক্ষেপশক্তি** ও অপরটা **আবরণশক্তি**। এই বিক্ষেপশক্তি লিঙ্গদেহ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডপর্য্যন্ত জগতের সৃষ্টি করে।' (বাক্যসুধা-১৩); এছাড়াও বেদান্ত সংজ্ঞামালিকাতেও (৫ নং শ্লোক) বলা হয়েছে 'শক্তিদ্বয়ং...' অর্থাৎ, অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুটি শক্তি।

বিক্ষেপশক্তি: শক্তিপ্রভাবে কোন বস্তু বিবিধরূপে প্রতীয়মান হয়, তাই মূলত বিক্ষেপশক্তি। জগদ্বীজ, নামরূপাত্মক মায়ার জননী, উপরে বাক্যসুধার তথ্যসূত্রেও রয়েছে জগৎ সৃষ্টি মূলত মায়ার বিক্ষেপশক্তির দ্বারাই হয়। এক

অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বহু নামরূপে প্রকাশিত হন, ব্রহ্ম মায়া যুক্ত হয়ে ঈশ্বর হন ও মায়ার দ্বারাই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন - এসবই মায়ার বিক্ষেপশক্তির কার্য।
আবরণশক্তি: মায়ার প্রভাবে পরমাত্মা নাম-রূপাদির বিকাশ করে ঐ নাম রূপের অন্তরালে নিজেকে আবৃত করে রাখেন। অসীম ব্রহ্ম সসীম আবরণে জীবের সম্মুখে উপস্থিত হন বিধায় মায়ার এই শক্তিকে আবরণ শক্তি বলে। জীবের বিভ্রান্ত দৃষ্টির কারণ এই আবরণশক্তি। আদিগুরু বলেছেন -

অন্তর্দৃগ্দৃশ্যয়োর্ভেদং বহিশ্চ ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
আবৃণোত্যপরা শক্তিঃ সা সংসারস্য কারণম্।।

অনুবাদ: আবরণশক্তি শরীরের মধ্যে দৃক্ আত্মা ও দৃশ্য অন্তঃকরণের ভেদ এবং বাহিরে ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদকে আবৃত করে, এই আবরণশক্তি সংসারের কারণ। (বাক্যসুধা - ১৫)

মায়া সম্পর্কিত প্রবন্ধটি এখানেই ইতি টানলাম। মায়া সম্পর্কিত পাঠকদের জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটানোর পাশাপাশি প্রচলিত সংশয়গুলোর কিছুটা হলেও এই প্রবন্ধের দ্বারা দূর হবে বলেই আশা করা যায়।
বন্দে শঙ্করাচার্য🙏

তথ্যসূত্র:
১) বেদান্ত দর্শন - অদ্বৈতবাদ (১ম খণ্ড), ডা: শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী
২) অদ্বৈতবাদ - রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্বিষ্ণুভাগবত - শ্রীধর টীকা
৪) উপনিষদ গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড), সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৫) উপনিষদ গ্রন্থাবলী, স্বামী গম্ভীরানন্দ
৬) (প্রধান) উপনিষদ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
৭) ঈশাদি অষ্টোত্তরশত উপনিষদ, চৌখাম্বা (হিন্দি)
৮) ব্রহ্মসূত্র (ভামতী), কালীবর বেদান্তবাগীশ ও দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
৯) পদ্মপাদাচার্যের পঞ্চপাদিকা, ইংরেজি অনুবাদ (Rajasevasakta D. Venkataramiah)
১০) বিদ্যারণ্য স্বামিকৃত পঞ্চদশী, স্বামী বাণেশানন্দ (অনুবাদক)
১১) গৌড়পাদীয় মাণ্ডুক্য কারিকা, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি
১২) শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী -১ম খণ্ড (আত্মবোধ, বাক্যসুধা), রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৩) বেদান্ত সংজ্ঞা মালিকা, উদ্বোধন কার্যালয়



ত্রিদেবী

পৃথা সান্যাল

মানুষের জীবনে জ্ঞান, সম্পদ ও সাহস - এই তিনটি শক্তিই সমানভাবে অপরিহার্য। জ্ঞানের আলো নিভে গেলে মানুষ অন্ধকারে পথ হারায়, সম্পদের অভাবে সেই জ্ঞান কার্যকর হতে পারে না, আর সাহসের অভাবে দুটোর কোনোটিই স্থায়ী হয় না। এই তিন শক্তিরই সমন্বিত রূপ হলেন ত্রিদেবী অর্থাৎ দেবী পার্বতী, মাতা সরস্বতী, সম্পদপ্রদায়িনী দেবী লক্ষ্মী। এই তিন দেবী তত্ত্ব আমাদের বলে, যে সমাজে বিদ্যা, সম্পদ ও ন্যায়বোধ একসাথে বিকশিত হয়, সেই সমাজই সত্যিকার অর্থে শান্তি ও কল্যাণ লাভ করে। ত্রিদেবীর মধ্য একজন হলেন দেবী সরস্বতী। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতে দেবী সরস্বতী হলেন বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী অর্থাৎ জ্ঞানের মূর্তিমান স্বরূপ। তিনি সৃষ্টিদেবতা ব্রহ্মার সহধর্মিণী এবং মহেশ্বরজয়া পার্বতীর সঙ্গে একত্রে ত্রিদেবী নামে পরিচিত। ‘সরস্বতী’ শব্দটি ‘সার’ এবং ‘স্ব’ দুটি শব্দের মিলনে গঠিত হয়েছে , যার অর্থ যিনি কারো মধ্যে মেধা ও জ্ঞান উদ্দীপ্ত করেন। এছাড়া ‘সরস্বতী’ শব্দটি সংস্কৃত ‘সুরস বতি’ থেকেও উদ্ভূত হয়েছে , যার অর্থ জলের আধার।
সরস্বতী সাক্ষাৎ দেবী মূর্তি এবং নদী-দুইরূপেই প্রকটিত। ঋগ্বেদে বর্ণিত করা হয়েছে-

অম্বিতমে নদীতমে সরস্বতী।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি॥

(ঋগ্বেদ সংহিতা - শাকল শাখা - ২/৪১/১৬)

অনুবাদ:- মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে সরস্বতী! আমরা অসমৃদ্ধের ন্যায় রয়েছি, আমাদের সমৃদ্ধশালী কর।
এই মন্ত্রে আমরা দেখতে পেলাম তিনি যেমন মাতৃগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ তেমনি নদীর মধ্যেও। ঋগ্বেদে বাগ্দেবী ত্রয়ীমূর্তি – ভূ: ভুব: স্ব:, জ্ঞানময়ীরূপে সর্বত্রব্যাপিনী। বিশ্বভুবন প্রকাশ তারই জ্যোতিতে। হৃদয়ে সে আলোকবর্তিকা যখন প্রজ্বলিত হয়, তখন জমাট বাধা অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার দূর হয়ে যায়। অন্তরে, বাইরে সর্বত্র তখন দীপ্ত হয় জ্ঞানের পুণ্য জ্যোতি। এই জ্যোতি-জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, এই জ্যোতিই সরস্বতী। তিনি আলোকময়ী, তাই তিনি সর্বশুক্লা। তিন গুণের মধ্যে তিনি সত্ত্বগুণময়ী, অনন্ত জ্ঞানময় ঈশ্বরের বাক্শক্তির প্রতীক বাগ্দেবী। স্কন্দ পুরাণে প্রভাসখণ্ডে দেবী সরস্বতীর নদীরূপে অবতরণের কাহিনী বর্ণিত আছে। বায়ু পুরাণ অনুযায়ী কল্পান্তে সমুদয় জগৎ রুদ্র কর্তৃক সংহৃত হয়, পুনর্বার প্রজাসৃষ্টির জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ অন্তর থেকেই দেবী সরস্বতীকে সৃষ্টি করেন। সরস্বতীকে আশ্রয় করেই ব্রহ্মার প্রজাসৃষ্টির সূচনা হয়। গরুড় পুরাণে সরস্বতী শক্তি অষ্টবিধা। শ্রদ্ধা, ঋদ্ধি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও স্মৃতি। তন্ত্রে এই অষ্টশক্তি যথাক্রমে যোগ, সত্য, বিমল, জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও প্রজ্ঞা। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সাধারণত ময়ূরবাহনা চতুর্ভুজা সরস্বতী পূজিত হন। ইনি অক্ষমালা, কমণ্ডলু, বীণা ও বেদপুস্তকধারিণী। দেবী সরস্বতী সনাতন ধর্মের দেবী হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিশেষভাবে পূজিত। গান্ধারে পাওয়া বীণাবাদিনী সরস্বতীর মূর্তিসহ সারনাথে সংরক্ষিত বিভিন্ন মূর্তিতে দেখা যায়, তিনি বীণা বাজাচ্ছেন—অবিকল হিন্দু ধর্মের সরস্বতী। মথুরায় জৈনদের প্রাচীন নিদর্শনে সরস্বতী এক চৌকো পীঠে বসে এক হাতে বই ধরা অবস্থায় দেখা যায়। শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যেও সরস্বতী পূজিত হতেন এবং তিনি জৈনদের চব্বিশ শাসক দেবীর মধ্যে একজন ও ষোল বিদ্যাদেবীর মধ্যে অন্যতম। ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা ও যমুনা নদী প্রধান

হলেও সরস্বতী নদী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হতো প্রসিদ্ধ তীর্থযজ্ঞ, যেমন সারস্বত যজ্ঞ। মহাভারতের রচনার আগেই সরস্বতী নদী রাজপুতানার মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, যদিও কিছু স্রোতধারা-চমসোদ্ভেদ, শিবোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদ-অবশিষ্ট ছিল। বিদ্যাভূষণ উল্লেখ করেছেন, বৈদিক যুগে লুপ্ত সরস্বতীর জলধারা আজও কচ্ছ ও দ্বারকার সমুদ্র উপকূলে মিলিত হয়েছে। যদিও সরস্বতী বৈদিক যুগের দেবী, তাঁর পূজার বর্তমান রূপ আধুনিককালে প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীন তান্ত্রিক সাধকরা সরস্বতীসদৃশা দেবী বাগেশ্বরীরও পূজা করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠশালায় প্রতি মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে ধোয়া চৌকির ওপর তালপাতা, দোয়াত-কলম রেখে ছাত্রছাত্রীরা সরস্বতী পূজা করত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী, গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ থেকে সরস্বতী উদ্ভূত হয়েছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে (আদিলীলা ২/৯-১৪) বর্ণিত আছে, যখন ব্রহ্মা সৃষ্টিকাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি একটি দেবী মূর্তির আবির্ভাব দেখলেন–তিনি হলেন সরস্বতী। দেবী সরস্বতীর উপস্থিতি জ্ঞান, শিক্ষা, বুদ্ধি ও কলার প্রসার ঘটায়। সরস্বতী দেবীর আশীর্বাদ ছাড়া মানুষের জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও শিক্ষা পূর্ণতা পেতে পারে না।

এই দেবীর প্রমাণ মন্ত্র:

ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে॥

সরলার্থ:- হে মহীয়সী, পদ্মলোচনা, বিশ্বরূপিণী ও বিশালাক্ষী বিদ্যাদেবী সরস্বতী, আমাকে জ্ঞান ও বিদ্যা প্রদান করো। আমি তোমাকে প্রণাম করি।



ত্রিদেবীর আরেকজন হলেন দেবী লক্ষ্মী। তিনি ধনসম্পদ, আধ্যাত্মিক সম্পদ, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী। তাঁর অপর নাম মহালক্ষ্মী ইনি সত্ত্ব গুণময়ী। লক্ষ্মী ছয়টি (শ্রী, সৌভাগ্য, শান্তি, পুত্রপ্রদা, মোক্ষদাত্রী, কল্যাণদাত্রী) বিশেষ গুণের দেবী। তিনি বিষ্ণুর শক্তিরও উৎস। মহাবিশ্বের সৃষ্টি, সুরক্ষা এবং রূপান্তর করতে বিষ্ণুকে সহায়তা করেন। যেমন রাম ও কৃষ্ণ রূপে অবতার গ্রহণ করলে, লক্ষ্মী সীতা, রাধা রূপে তাঁদের সঙ্গিনী হন। সাধারণত দেবী লক্ষ্মী লাল বা স্বর্ণালী পোশাকে সজ্জিত, পদ্মফুলে উপবিষ্ট। দেবীর চার হস্ত; বাম দিকের দুই হাতে রয়েছে পদ্মফুল ও বরদা মুদ্রা এবং ডান দিকের দুই হাতে রয়েছে অভয় মুদ্রা এবং পদ্মফুল। তাঁর বাহন পেঁচা। এই সম্পর্কে স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত আছে, একদিন মহর্ষি নারদ, যিনি মহাজ্ঞানী এবং প্রতিটি দেবীর গুণকাহিনী জানেন, বিষ্ণুর নিকট গিয়েছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন, "প্রভু, আমি অনেক দেবীর গুণ, জন্ম ও কীর্তি শুনেছি, কিন্তু মনসী দেবীর বা ষষ্ঠী দেবীর প্রকৃত চরিত আমি জানি না। অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁর সম্পূর্ণ ইতিহাস বলুন।" নারায়ণ বললেন, "নারদ, সকল দেবীর জন্ম, গুণ এবং কর্ম আলাদা। মনসী দেবী, যাঁকে ষষ্ঠী দেবীও বলা হয়, শিশুদের রক্ষা, সন্তানপ্রদ এবং ধন-সম্পদ দানে নিয়োজিত। জন্মের মুহূর্ত থেকেই তিনি ভক্তদের মঙ্গলার্থে সক্রিয় হন। মনসী দেবী অত্যন্ত সুন্দরী। তাঁর রূপ শুভ্রচম্পকবর্ণের, স্থির যৌবনময়ী এবং চিরসুন্দরী। তাঁর চোখে আলো ঝলমল করে, মুখে মৃদু হাসি থাকে এবং সমগ্র উপস্থিতি থেকে শান্তি ও আনন্দের জ্যোতি ছড়ায়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আধ্যাত্মিক যোগে সিদ্ধ হয়ে, ভক্তদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়ী হন। মনসী দেবী একাধারে বৈষ্ণবী, শৈবী, নাগেশ্বরী এবং সিদ্ধযোগিনী। তিন যুগের তপস্যা সম্পন্ন, এবং পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রতি সমর্পিত। তিনি যেকোনো বিপদ, দুশ্চিন্তা ও অসুখ দূর করতে সক্ষম। দেবীর উপস্থিতি এমন যে, যিনি তাঁর ধ্যান বা পূজা করেন, তিনি সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি লাভ করেন।

দেবীর আরাধনা করতে রাজা প্রিয়ব্রত শালগ্রাম, বটমূল অথবা পুত্রলিকার মাধ্যমে পূজা শুরু করেন। তিনি দেবীর

পূজা, স্তোত্রপাঠ এবং ধ্যানের মাধ্যমে সন্তান, সুস্থতা, ধন-সম্পদ, বিদ্যা এবং সুখ লাভ করতে শুরু করেন। দেবীর কৃপা ও দয়া ভক্তদের সমস্ত কষ্ট দূর করে এবং তাদের মঙ্গলার্থে সক্রিয় থাকে। মনসী দেবী জন্মের পর থেকেই শিশুদের রক্ষক হন। যিনি তাঁর পূজা বা স্তোত্রপাঠ করেন, তিনি সকল শত্রু, বিপদ এবং কষ্ট থেকে মুক্ত হন। দেবীর দৃষ্টি ও করুণার ফলে ভক্তদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি এবং সন্তানসুখ আসে।

লক্ষ্মী দেবীর প্রমাণ মন্ত্র:-

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বত পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী নমহস্তুতে।।

সরলার্থ:- দেবী লক্ষ্মী, যিনি বিশ্বরূপের (বিষ্ণুর) পত্নী, পদ্মের উপর বাস করেন এবং পবিত্র ও শুভ, আপনি সর্বদিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন। দেবী মহালক্ষ্মী, আপনাকে প্রণাম।

ত্রিদেবীর অন্যতম হলেন দেবী পার্বতী। তিনি শক্তি, সাহস, প্রেম, ন্যায়ের প্রতীক। সংসারধর্ম পালন থেকে শুরু করে অসুরবিনাশ-সবক্ষেত্রেই দেবী পার্বতীর প্রভাব অপরিসীম। তিনি হিমালয়ের কন্যা ও শিবের পত্নী। উমা, গৌরী, দুর্গা, কালী-এই সমস্ত রূপেই তিনি পূজিতা। দেবী মাহাত্ম্যে তাঁকে বলা হয়েছে সর্বভূতের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপিণী। পার্বতী ছাড়া সরস্বতী ও লক্ষ্মীর পূর্ণতা হয় না। তাই তিনি আদ্যাশক্তি, ত্রিদেবীর অন্তরতম শক্তিরূপ।

ঘটনা অনুসারে, পূর্বজন্মে সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব গভীর তপস্যায় লীন হন। মহর্ষি নারদের পরামর্শে হিমালয়রাজ তাঁর কন্যা পার্বতীকে শিবের সেবায় নিযুক্ত করেন। প্রতিদিন পার্বতী কাশ্যপ মুনির আশ্রমে গিয়ে শিবের পূজা করতেন এবং কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। প্রথমে ফলাহার, পরে পাতাহার, শেষে জলত্যাগ করে কেবল বায়ু পান করে তিনি সহস্র বছর তপস্যা করেন। তাঁর এই মহাতপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা ও দেবতারা আবির্ভূত হয়ে আশীর্বাদ দেন যে তিনি শিবের পত্নী হবেন। দেবতারা মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে কামদেবকে প্রেরণ করেন। বসন্তের সহায়তায় কামদেব মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করে শিবের মনে প্রেমোদয় ঘটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু শিব তা অনুভব করে তৃতীয় নেত্র খুলে কামদেবকে ভস্ম করে দেন। পার্বতী নিরাশ না হয়ে তপস্যা অব্যাহত রাখেন। শিব অবশেষে গোপনে এক ব্রাহ্মণের রূপে এসে পার্বতীর তপস্যার পরীক্ষা নেন। ব্রাহ্মণরূপী শিব তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে শিব কঠিনস্বভাবী, ভিক্ষুকসদৃশ, তাকে বিবাহ করা উচিত নয়। কিন্তু পার্বতী দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করেন যে তিনি শিব ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ করবেন না। তখন শিব স্বরূপ প্রকাশ করে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। এরপর দেবতাদের উপস্থিতিতে হিমালয়প্রাসাদে মহাসমারোহে বিবাহের আয়োজন হয়। বিষ্ণু কন্যাদান করেন, ব্রহ্মা মন্ত্রপাঠ করেন, সপ্তর্ষি ও দেবগণ সবাই উপস্থিত থেকে আচার সম্পন্ন করেন। সুসজ্জিত বরযাত্রা নিয়ে মহাদেব আগমন করেন - গঙ্গা, চন্দ্র, নন্দী, গণ ও ভূতপ্রেতসহ অদ্ভুত শোভাযাত্রা হয়। প্রথমে পার্বতীর মা মেনকা এই রূপ দেখে আতঙ্কিত হলেও পরে শিবের শান্ত ও মনোহর রূপ দেখে কন্যাদান করেন। সকল বিধি-বিধান অনুসারে শিব-পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। শিব-পার্বতীর ঐক্যেই জগতে শক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এই শক্তিই পরবর্তীতে মহিষাসুর, মধু-কৈটভ প্রভৃতি অসুরদের বিনাশের জন্য দেবী রূপে আবির্ভূত হন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে দেবতাদের আহ্বানে এই শক্তি মহাশক্তিরূপে মধু–কৈটভকে বধ করেন। কল্পান্তে যখন সমগ্র জগৎ একসমুদ্রে নিমগ্ন, তখন শ্বেতশায়ী বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর জন্ম নেয়। তারা ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, ব্রহ্মা যোগনিদ্রারূপা মহামায়াকে স্তব করেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহামায়া বিষ্ণুর অঙ্গ থেকে প্রকাশিত হলে তিনি জাগ্রত হন। বিষ্ণু অসুরদ্বয়ের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধ করেন। মহামায়ার প্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে তারা বর দিতে চায়। তখন বিষ্ণু বলেন - "আমার বর এই যে তোমরা আমার দ্বারাই নিহত হবে।" অসুররা শর্ত দেয় - "যেখানে জল নেই সেখানে আমাদের বধ করো।" বিষ্ণু তাদের উরুর উপর স্থাপন করে সুদর্শন চক্র দিয়ে উভয়ের মস্তক ছেদন করেন। এভাবেই মহামায়ার কৃপায় মধু–কৈটভ বধ হয় এবং জগতের প্রথম রক্ষা সম্পন্ন হয়। স্বর্গ-মর্ত্য উভয়ই আবার অশুভ শক্তির দাপটে কেঁপে উঠছিল। মহিষাসুর নামে এক অমোঘ শক্তিধর অসুর ব্রহ্মার বরদান পেয়ে দেবতা ও মানুষের শান্তি বিনষ্ট করছিল। তার সৈন্যরা প্রতিনিয়ত গ্রাম-নগরী আক্রমণ করত, নিরীহ মানুষদের নিপীড়ন করত। দেবতারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কাছে সাহায্যের জন্য গেলেন। তাদের ত্রিদেবীয় শক্তি মিলিত হয়ে জন্ম নিলেন দেবী দুর্গা। প্রথমেই দেবী দুর্গা মহিষাসুরের সৈন্যদের বিরুদ্ধে রওনা হলেন। মহিষাসুরের সৈন্যরা অসীম বল এবং মায়াশক্তিতে সজ্জিত, কিন্তু দেবীর ত্রিশূল, তলোয়ার, চক্র ও গদার সম্মুখে অসুর সৈন্যদের সকল আক্রমণই ব্যর্থ হচ্ছিল। দেবীর কৌশল, করুণা ও অদম্য শক্তির কাছে

পরাজিত হলো সৈন্যরা। তাদের মধ্যে ধূম্রলোচন নামে এক ভয়ঙ্কর অসুর ছিল। সে অশুভকামে উন্মত্ত হয়ে মানুষের শান্তি বিনষ্ট করছিল, গ্রাম-নগরী জ্বালাচ্ছিল, নিরীহ প্রাণীদের নিপীড়ন করছিল। দেবী মহামায়া এই অসুর বধের নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করলেন, দেবীর বজ্রগর্জনে আকাশ কেঁপে উঠল। যুদ্ধ শুরু হতেই ধূম্রলোচন আক্রমণ করল। কিন্তু দেবী তাঁর ত্রিশূল, তলোয়ার, চক্র ও গদা দ্বারা প্রতিটি আঘাত প্রতিহত করলেন। তার শক্তি বিনষ্ট করলেন,



মনোবল ভেঙে দিলেন এবং শেষপর্যন্ত এই অসুরকে পরাজিত করলেন। তারপর এল রক্তবীজ, যার রক্ত মাটিতে পড়লেই সেখান থেকে জন্ম নিত নতুন রক্তবীজ। দেবী মহামায়া তখন দেবী কালিকা রূপ ধারণ করলেন। রক্তবীজের রক্তকে মাটিতে পড়তে না দিয়ে সেই রক্ত পান করলেন আর এভাবেই রক্তবীজকে বধ করলেন। এরপর এলো শুম্ভ নিশুম্ভ নামক দুই অসুর। দেবীমাহাত্ম্যম্ অনুযায়ী, এরা হলেন অসুর ভ্রাতৃদ্বয়। দেবী মহামায়া তখন কৌশিকী রূপ ধারণ করলেন। কৌশিকী রূপে তিনি এদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধের শেষে এরা দেবীর হস্তেই পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। অবশেষে এল মহিষাসুর। সৈন্যদের পতনের পর মহিষাসুর নিজের গর্ব ও শক্তি নিয়ে দেবীর সঙ্গে মুখোমুখি হল। মহিষাসুর ও দেবীর মধ্যে প্রবল যুদ্ধ শুরু হল। মহিষাসুর সর্বোচ্চ শক্তি ও ছল ব্যবহার করল, কিন্তু দেবী মহামায়ার রূপে তাঁর ত্রিশূল, চক্র, তলোয়ার, গদা এবং অন্যান্য অস্ত্রের জোরে প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করলেন। প্রতিটি যুদ্ধে মহিষাসুর দুর্বল হয়ে গেল। অবশেষে, দেবী তাঁর অসীম শক্তি ও কৌশল দ্বারা মহিষাসুরকে পরাজিত করলেন। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল এবং মর্ত্যে শান্তি ফিরে এল।

এভাবে দেবী মহামায়া বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়ে ত্রিলোকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেলেন। তাঁর প্রত্যেক রূপই মহিমা, শক্তি ও করুণার প্রতীক হয়ে বিশ্বজগতে সমতার আলো ছড়িয়ে দিল।

এই দেবীর প্রণাম মন্ত্র:-

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে।।

সরলার্থ:- হে নারায়ণী, হে গৌরী, তুমি সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপা, কল্যাণদায়িনী, সকল প্রকার সুফল প্রদায়িনী, আশ্রয়স্বরূপা, ত্রিনয়না তোমাকে বারবার নমস্কার জানাই।

তথ্যসূত্র:

১) ঋগ্বেদ শাকল শাখা
২) মার্কণ্ডেয় পুরাণ
৩) শিব পুরাণ
৪) শ্রী শ্রী চন্ডী
৫) Wikipedia

সনাতন ধর্ম এক অশ্বত্থ বৃক্ষ

নিরঞ্জন চন্দ্র দাশ



হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অনেকে মনে করে থাকেন এ ধর্ম দুর্বোধ্য ও অযৌক্তিক। এরূপ মনে করার কারণ এর বিশালতা। কতগুলি বিশ্বজনীন মৌলিক সত্য রয়েছে এবং বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে নিরূপিত সে সত্যের উপর হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এ যেন বিশাল এক অশ্বত্থ বৃক্ষ! এর শাখা-প্রশাখা অসংখ্য। অনেকে এর কোনটি শাখা, কোনটি উপশাখা বুঝতে পারেন না। কাজেই যে কোনো শাখা বা উপশাখাকে ধরে হিন্দু ধর্মকে বুঝতে গিয়ে ভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। আবার এর যে কোনো শাখা বা প্রশাখা হিন্দু ধর্মের সার্বিক পরিচায়ক নয়। আমরা জানি যে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় রয়েছে হিন্দু ধর্মে। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত কত মতবাদ; জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ-কত মার্গ! এগুলো ধর্মের সোপান। কাজেই কোন পথ অবলম্বন করা উচিত তা নির্ণয় করা একটু কঠিন বৈকি! কঠিন হলেও এর সমাধান আছে। বিশেষ বিবেচ্য যে, এর কোনো একটিকে বাদ দিলে হিন্দু ধর্মের সার্বিক রূপ পাওয়া যাবে না। কিন্তু বর্তমানে আমরা যেকোনো একটিকে নিয়ে অন্যটিকে বড় ছোট করে ফেলি যার ফলস্বরূপ আজ আমাদের ধর্মের এই অবস্থা। যাদের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান সীমিত তারা এই দ্বিধার জন্যই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় নয়তো ধর্ম ত্যাগ করে চলে যায়। আসলে এসব ভিন্ন মতবাদ সকলই সমসূত্রে গাঁথা। এ সূত্রটি হলো বেদচতুষ্টয়।

বেদ হিন্দুর মূল ধর্ম গ্রন্থ। এ ধর্মগ্রন্থে কি আছে, আর কি নেই সে বিষয়ে অবহিত হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা করা সমীচীন। বেদ অর্থ জ্ঞান। খ্রীস্টের জন্মের বহু বছর পূর্ব এ বেদের সৃষ্টি। এর দুটি বিভাগ আছে। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ কর্মকাণ্ড। সংহিতা এবং ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া ও মন্ত্রাদি আছে। বেদের জ্ঞানকাণ্ড হচ্ছে ব্রাহ্মণের অংশ আরণ্যক ও উপনিষদ। বেদের অন্তভাগ বিধায় উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয় - সমগ্র বেদের সার, জ্ঞানের বিষয় এখানে। গুরুর পাদপদ্মে উপবিষ্ট হয়ে এই বিদ্যা আহরণ করতে হয়। সমগ্র বেদের শীর্ষস্থানীয় এ বিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। এগুলো ছাড়াও আরো রয়েছে পুরাণ, ইতিহাস গ্রন্থ মহাভারত ও রামায়ণ এগুলোকে

পঞ্চম বেদ বলা হয়।
যে সব মতবাদ বা ভাবাদর্শ বেদকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে না বা উপনিষদে সংগৃহীত বেদের সারতত্ত্বগুলিকে গ্রহণ করে না, এবং পুরাণকে অস্বীকার করে সেসব মতবাদকে হিন্দুধর্মের অঙ্গ বলা যায় না। উপনিষদ পুরাণসহ শ্রুতিকে বেদ বলা হয়। বেদ, উপনিষদ,পুরাণ ও ইতিহাস গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত সবগুলোকে মান্য যারা করে তারাই মূলত ধর্মকে রক্ষা করার কার্য করে; এর মধ্যে যাহারা একটিকেও অমান্য করে বুঝতে হবে সে শুধু নিজের বা সংগঠনের স্বার্থকেই সর্ব উপরে রাখে।

বেদ কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত নয়। পরমার্থ তত্ত্ব ঋষিগণের উপলব্ধ এবং গুরশিষ্যপরম্পরায় শ্রুত বলে এর নাম শ্রুতি। যুগ যুগ ধরে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি দ্বারা এ জ্ঞান আহরণ করা হয়েছে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের এ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান জড় বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নিশ্চয়ীভূত হয় না। দ্রষ্টার অনুভূতি অঙ্কশাস্ত্রের মতো অভিন্ন না-ও হতে পারে। এতদসত্ত্বেও ঋষিগণের পুঞ্জীভূত অনুভূতির মধ্যে এ মৌলিক ভাবধারায় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে এদের তুরীয় দর্শনের সত্যতা প্রমাণিত। কাজেই বেদ স্বপ্রমাণ ও স্বপ্রকাশ।
হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার প্রবক্তাদের মধ্যে কিছু গৌণ অনুসিদ্ধান্ত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে; কিন্তু মৌলিক তত্ত্বে মতভেদ নেই। এ পার্থক্যগুলো দেখে সাধারণ মানুষ বিচলিত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে - আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চস্তরে আরোহণ না করে এসব সূত্র তত্ত্বগুলোর বিষয়ে ব্যাখ্যার নিগূঢ়তা উপলব্ধি করা অসম্ভব নয় কি? এ বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই এসব বিষয়ের ভ্রান্ত ধারণা বর্জ্জনীয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আচার-ব্যবহারে কিছু কুসংস্কার রয়েছে। বহু গ্রহিষ্ণু বিজাতীয় মতবাদ এ ধর্মকে গ্রাস করবার চেষ্টা করেছে। এসবকে উপেক্ষা করেও এই ঔপনিষদিক ধর্ম মাথা উঁচু করে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে আজও। এ অবিনাশী শক্তির মূলে রয়েছে এর সার্বভৌমত্ব। হিন্দু ধর্মের সারতত্ত্ব বেদান্তে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা বেদান্তের সার।
স্বামী বিবেকানন্দ গীতাকে বেদান্তের দৈবভাষ্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইস্কন প্রকাশিত ভক্তিবাদী গীতা ভাষ্য, জগদীশ্বরানন্দের কর্ম প্রধান ভাষ্য সহ অনেক ভাষ্যই রয়েছে - কারণ এই গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধর্মের মূল উৎসগুলিতে সাম্প্রদায়িক মতবাদের কোনো স্থান নেই। এতে আছে কিছু দেবাতাত্মা মানুষের নৈর্ব্যক্তিক পারমার্থিক অনুভূতি। সর্বস্তরের দর্শন, কবিতা ও সঙ্গীত একীভূত হয়েছে এ ধর্মে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অসংখ্য মনীষীগণ সর্বজনীন এ ধর্মতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন গভীরভাবে। এ প্রসঙ্গে জার্মান দার্শনিক শোপেন হাওয়ারের উপলব্ধি লক্ষণীয় - 'সারা পৃথিবীতে বেদান্তের ন্যায় এত উন্নত ও মঙ্গলদায়ী পাঠ্য কিছু নেই। জীবিত অবস্থায় আমি এ সান্তনা পেয়েছি, মৃত্যুকালে পাব প্রশান্তি।' সুপরিচিত ম্যাক্সমূলারের উপলব্ধি অনুযায়ী - 'পৃথিবীতে যত দার্শনিক মতবাদ আছে তার মধ্যে বেদান্ত সর্বাপেক্ষা মহীয়ান এবং যত ধর্মমত আছে তার মধ্যে বেদান্ত সর্বাপেক্ষা শান্তিদায়ক।'
হিন্দু ধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাসী। ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের আবির্ভাব হলে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান নরদেহে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কোনো কোনো দেশে ধর্মীয় মহাপুরুষকে ঈশ্বরের পুত্র এবং দূত হিসেবে মনে করা হয়। এবং তৎপ্রবর্তিত বাণীই চূড়ান্ত ধর্মীয় তত্ত্ব বলে মানা হয়। যারা এটি মানতে রাজি নয়, তারা অবিশ্বাসী বলে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। লক্ষণীয়, এসব ধর্মে প্রশ্ন-মীমাংসার কোনো স্থান নেই। হিন্দু ধর্মে অবতারও কিন্তু অনন্য নন।
অধর্মের অভ্যুদয় যুগে যুগে হয় এবং প্রতিকারের জন্য ভগবানকে বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হতে হয়। সব যুগের সমস্যা একরূপ থাকে না। কাজেই সমাধানের বিধানও স্থান কাল-নির্বশেষে এক হতে পারে না। তাই হিন্দুশাস্ত্র মতে অবতার একাধিক। মানুষের মধ্যেও দেবত্ব বা ভগবৎ শক্তির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেসব মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিশেষ বিকাশ ঘটে তাকে অমূর্ত ব্রহ্মের প্রতিভূ বলা হয় এবং তিনিই অবতার। শাস্ত্রে এর উল্লেখ আছে। এসব লক্ষণযুক্ত হলে অপর ধর্মের প্রবর্তককে অবতার বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করি না। হিন্দুধর্মাবলম্বীগণ এভাবে শ্রী রাম, শ্রী কৃষ্ণের মত বুদ্ধকেও অবতার বলে মানে।
সেভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধ-খ্রীস্টান না হয়েও বুদ্ধ ও খ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কুণ্ঠা বোধ করে না। এভাবে হিন্দু ধর্মে উদারতাই পরিলক্ষিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন- 'ধর্ম হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব।' 'ব্রহ্মৈব স্যাং ব্রহ্মাপ্যোতে' মানুষের মধ্যে এ দেবত্বের বিকাশ দেখে স্থান-কাল-জাতি-নির্বিশেষে হিন্দুরা শ্রদ্ধা জানায়। কেউ যদি একজন অবতার বা ভগবৎ প্রতিনিধির নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন না করে তাহলে সে ব্যক্তি ধর্ম পতিত হবে।
ঈশ্বরানুভূতি বা ব্রহ্মজ্ঞান যদি ধর্মের লক্ষ্য থাকে এবং ভগবৎ প্রেরিত নররূপী ভগবান নানা যুগে নানা পথের সন্ধান দেন, তাহলে এর যে কোনো নিষ্ঠার সাথে অবলম্বন করে চললে একই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়। শ্রী ভগবান



গীতামুখে বলেছেন-

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ। (গীতা-৪/১১)

যে যেভাবে আমার শরণাপন্ন হয় আমি তাকে সেভাবেই অনুগ্রহ করি।
এই মহাবাক্যে এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এ তাৎপর্য উপলব্ধি না করে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করা অর্বাচীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যা-খুশি করলেই হিন্দুধর্ম- এরূপ অপব্যাখ্যা অজ্ঞতার নামান্তর। প্রপদ্যন্তে শব্দে বলা হয়েছে - আমাতে শরণাগত হও। এটি বুঝলে ভাব পরিস্কৃত হবে। ভগবদগীতায় এরূপ অনেক শব্দের অবতারণা রয়েছে। যেমন- মামুপেত্য ৮/১৬, ব্যাপাশ্রিত্য ৯/৩২, মামাশ্রিত্য ৭/২৯। এসব শব্দ গভীর ভাববহ। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাসহ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করলে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ - যে কোন মার্গ অবলম্বন করে ভগবৎ প্রাপ্তিই ঘটে। এমন কি অন্য ধর্মেও যদি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সকলের স্রষ্টা হন তাহলে একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়। আবার ঈশ্বরকে লাভ করাই যদি প্রতিটি ধর্মের উদ্দেশ্য থাকে তাহলে কোন ধর্মের প্রবক্তাই নতুন কোন ঈশ্বরের পরিকল্পনা করে প্রার্থনা করবার উপদেশ দিতে পারেন না। অন্যদিকে প্রতিটি ধর্মের অনুসারিগণ যদি উপলব্দি করেন যে অন্যান্য ধর্মমতবাদিগণও সেই একই ঈশ্বরের উপাসনা করছেন তাহলে কোনো সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হতে পারে না, বরং ধর্ম সম্বন্ধে ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অবসান ঘটবে।

বিশেষ ধন্যবাদ: স্বামী অক্ষরানন্দ

মহাভারতের নগরী হস্তিনাপুর

দীপান ভট্টাচার্য

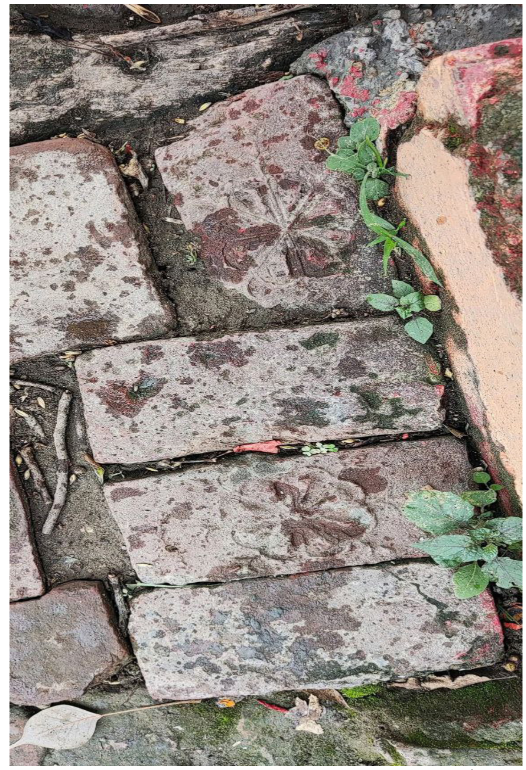
হস্তিনাপুর, যার অর্থ হল 'হস্তির নগরী'। এই হস্তি মানে কিন্তু হাতি নয়। পুরাণ ও মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী, পুরুবংশের একজন প্রভাবশালী রাজা ছিলেন হস্তী আর তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই নগরী আর তাই হস্তিনাপুরের নামকরণও তাঁর নাম অনুসারে হয়েছে। মহাভারতের যুগে এই নগরী ছিল কুরু বংশের রাজধানী। মহাভারতের কাহিনির অনেকটাই দখল করে আছে এই নগর। দিল্লীর খুব কাছেই অবস্থান হস্তিনাপুরের, মাত্র ১৫০ কিলোমিটারের মত। এখন মীরাট যাওয়ার এমন সুন্দর রাস্তা হয়ে গেছে যে মাত্র ঘণ্টা তিনেকে দিল্লী থেকে পৌঁছে যেতে পারবেন হস্তিনাপুর।

হস্তিনাপুরের ভৌগোলিক অবস্থান গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে তাই এর অবস্থানের কৌশলগত ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল বিশাল। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা অনুসারে, এই অঞ্চল বহু প্রাচীন সভ্যতার ধারক। গেরুয়া রঙের মৃৎপাত্র সংস্কৃতি এবং চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র ১৯৫০–৫২ সালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা বি বি লাল পরিচালিত খননে হস্তিনাপুরে এক বিস্ময়কর ইতিহাসের স্তর উন্মোচিত হয়ে উঠেছিল। বোঝা গিয়েছিল যে প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি এখানে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে। ডঃ লাল খননে মহাভারতের ঘটনাগুলির সঙ্গে কয়েকটি চমকপ্রদ মিলও খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর খননে পাওয়া গেছে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্তর—

১. গেরুয়া মৃৎপাত্র সংস্কৃতি (Ochre Coloured Pottery Culture, ২০০০–১৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দ): প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগের নিদর্শন। হাতে তৈরি গেরুয়া রঙের পাত্র এই স্তরের বৈশিষ্ট্য।

২. চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতি (Painted Grey Ware Culture – PGW, ১২০০–৮০০ সাধারণ পূর্বাব্দ): এই স্তরের মৃৎপাত্রে দেখা যায় ধূসর গাত্রের উপর কালি দিয়ে আঁকা জ্যামিতিক নকশা। বি বি লালের মতে, এই স্তরের জনগণই মহাভারতে বর্ণিত কুরু বংশ হতে পারে।





৩. উত্তরের কৃষ্ণ মসৃণ মৃৎপাত্র সংস্কৃতি (Northern Black Polished Ware Culture – NBPW, ৭০০–২০০ সাধারণ পূর্বাব্দ): চকচকে কৃষ্ণ রঙের পাত্র, ধাতব মুদ্রা, ইট নির্মাণ প্রমাণ করে মৌর্য ও উত্তর-মৌর্য যুগের উন্নত নগরসভ্যতা। এই সময়ের নগরী ছিল ষোড়শ মহাজনপদের অন্তর্গত।
৪. কুষাণ যুগ (Kushan Period, ১ম–৩য় শতাব্দী): এই স্তরে মেলে টেরাকোটা মূর্তি ও অনেক কাঠামোর নিদর্শন।
৫. গুপ্ত যুগ থেকে মধ্যযুগ (Gupta to Medieval Period, ৪র্থ–১৫শ শতাব্দী): মুদ্রা, ভবনের ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য উপাদান মেলে এই স্তরে।

খনন রিপোর্ট থেকে ধ্বংসস্তূপের একটি লম্বচ্ছেদের ছবি দেওয়া হলো যেখানে স্তরগুলির অবস্থান দেখতে পাবেন। হস্তিনাপুরে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার ছিল এক ভয়াবহ বন্যার নিদর্শন যেখানে পাওয়া গিয়েছিল ঘন পলি ও কাদার স্তর। এটি ইঙ্গিত দেয় যে বন্যার ফলে হঠাৎ করে জনপদটি ত্যাগ করা হয়েছিল। মহাভারতে বলা হয়েছে, এক ভয়াবহ গঙ্গার বন্যা হস্তিনাপুরকে গ্রাস করে। ফলে কুরু বংশের রাজা নিকক্ষু (Nicakṣu) রাজধানী স্থানান্তর করে কৌশাম্বীতে নিয়ে যান। বি বি লাল এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে সেই ঐতিহাসিক বর্ণনার সঙ্গে মিল আছে বলেছেন। তবে একবারও ভাববেন না যে এতে মহাভারতের কাহিনির প্রমাণ পাওয়া গেল। মহাভারতের কাহিনির কোন সরাসরি পাথুরে প্রমাণের উল্লেখ হস্তিনাপুর খনন রিপোর্টে নেই। যেমন কলকাতা আছে আর তাতে রজনী সেন রোড আছে বলে ফেলুদার অস্তিত্ব ছিল যেমন ভাবা যায় না, তেমনই এখানেও। আমি যখন হস্তিনাপুর পৌঁছেছিলাম তখন সেখানকার সবচেয়ে বড় ধ্বংসস্তূপের একাংশে খনন চলছিল। একটি স্থাপত্যের কাঠামো উন্মোচিত হয়ে রয়েছে যার ইটের আকার দেখে তা কুষাণ যুগের বলেই মনে হয়। তবে আন্দাজে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না।
হস্তিনাপুরের ইতিহাস শুধু হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থেই নয়, জৈন ধর্মীয় গ্রন্থ ও ইতিহাসেও উল্লিখিত হয়েছে। এটি জৈন ধর্মের একটি তীর্থস্থান, যেখানে বহু তীর্থঙ্করের জন্মস্থান ও তপস্যাস্থল হিসেবে বিবেচিত স্থান রয়েছে। সে নিয়ে অন্য লেখায় বিস্তারিত দেওয়া যাবে।

তথ্যসূত্র:
১) Lal, B.B., "Excavations at Hastinapur and Other Explorations...", Ancient India, No. 10 (1954)
২) Lal, B.B., "The Earliest Civilization of South Asia", New Delhi, Aryan Books (1997)
৩) Lal, B.B., "Mahabharata and Archaeology", Indian History and Culture Society (1984)

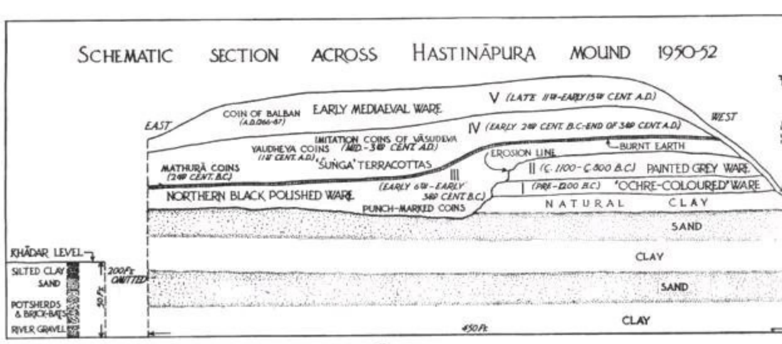


FIG. 2



শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অদ্বৈতবাদ

অর্ক বিশ্বাস
গবেষক, সনাতন শাস্ত্র গবেষণা কমিটি

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ভারতীয় দর্শনের এমন এক মহাগ্রন্থ, যেখানে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ—সমস্ত পথই পরমসত্যের উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়। এই মহাগ্রন্থের নানা শিক্ষাকে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মধ্যে অদ্বৈত বেদান্ত গীতার শ্লোকসমূহকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে পরমাত্মা ও জীবাত্মার গভীর ঐক্যের বার্তা উপলব্ধি করেছে। গীতার অন্তর্নিহিত জ্ঞানতত্ত্বে প্রকাশ পেয়েছে এক অখণ্ড সত্য—যেখানে ভেদ ও বিভেদের আবরণ সরিয়ে একক পরমসত্তার প্রতিফলনই ধ্যানগম্য হয়। এই আলোচনায় শ্রীমদ্ভগবদগীতার বেশ কিছু শ্লোক তুলে ধরতে চাই, যেগুলি অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞানের আলোয় জীবের সমস্ত ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হয়ে এক অখণ্ড সত্যের তথা ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে নিহিত এই আধ্যাত্মিক ঐক্যের দর্শনই অদ্বৈতবাদের প্রাণ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে একবার ফিরে দেখা প্রয়োজন বেদ অদ্বৈতবাদকে সমর্থন করে কিনা। ঋগ্বেদ সংহিতার শাকল শাখায় এক স্থানে একজন ঋষিকা আত্মজ্ঞান লাভ করে পরমাত্মার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। আত্মজ্ঞান লাভের পর তিনি উপলব্ধি করেন যে, পরব্রহ্ম আত্মা থেকে ভিন্ন নয়; বরং আত্মারূপেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই পরমসত্তা নিজেই সমগ্র ভুবনে জীবরূপে প্রবিষ্টা, অর্থাৎ প্রত্যেক সত্তার অন্তরে আত্মারূপে তিনিই অবস্থান করছেন। এই উপলব্ধি সরলভাবে অদ্বৈত তত্ত্বকেই প্রকাশ করে।

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥

(ঋগ্বেদ সংহিতা –শাকল শাখা –১০/১২৫/৩)

সরলার্থ:- আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধন-প্রদাত্রী, পরব্রহ্মকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপে সাক্ষাৎকারিণী। অতএব, যজ্ঞার্হগণের মধ্যে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা ও সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকেই সর্বদেশে সুরনরাদি যজমাণগণ বিবিধভাবে আরাধনা করে।

কঠোপনিষদে এক গভীর উপমার মাধ্যমে অদ্বৈত তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে — যেমন অগ্নি দাহ্য পদার্থে প্রবেশ করে দহনের সময় সেই পদার্থের আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনি এক ও অভিন্ন আত্মা সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত থেকে প্রত্যেক সত্তার রূপ অনুযায়ী প্রকাশিত হন এবং তাঁদের বহির্ভূত অবস্থাতেও বিরাজমান থাকেন। অর্থাৎ, সকল জীব ও জগতে যে একক পরমতত্ত্ব আত্মারূপে বিরাজমান, এই উপলব্ধিই প্রকৃত অদ্বৈত দর্শনের প্রতিফলন—যা শ্রুতি দ্বারা সমর্থিত।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপ বহিশ্চ॥

(কৃষ্ণ যজুর্বেদ-কঠ উপনিষদ-২/২/৯)

সরলার্থ:- জগতে প্রবেশ করে একই অগ্নি (পঞ্চভূতের একটি ভূত তেজতত্ত্ব) দাহ্য পদার্থের আকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। সেই ভাবে একই আত্মা সর্বভূতের অন্তরে থেকে নানারূপে প্রতিভাত হয়েছেন এবং তাদের বাইরেও আছেন।

এবার আমরা শ্রীমদ্ভগবদগীতার দিকে অগ্রসর হই।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটি শ্লোকে বলেছেন—সত্য ও যথার্থ সমদৃষ্টিসম্পন্ন যোগী সেই, যিনি সর্বত্র সকল প্রাণীর মধ্যে নিজের আত্মাকে এবং নিজের আত্মার মধ্যে সকল প্রাণীকে সমরূপে প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ, একই আত্মাকে সকল জীবের অন্তরে সমভাবে অবস্থিত দেখতে পারা এবং কোনো প্রকার ভেদবুদ্ধি না থাকা—এই সমদৃষ্টিই প্রকৃত জ্ঞান, এবং একেই অদ্বৈত-তত্ত্বের উপলব্ধির মূল সারার্থ বলা যায়।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৬/২৯)

সরলার্থ:- সর্বব্যাপী অনন্ত চেতনে একীভাবে স্থিতিরূপ যোগ-যুক্ত আত্মাবিশিষ্ট (তথা) সর্বত্র সমদর্শনবিশিষ্ট যোগী আত্মাকে সকল প্রাণীতে (বরফে জলের মতো ব্যাপক দেখে) আর সকল প্রাণীকে আত্মাতে দেখে।

অনুরূপ একটি বক্তব্য ঈশোপনিষদেও প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে —যিনি সমস্ত ভূতকে আত্মার মধ্যেই দেখেন এবং সমস্ত ভূতের মধ্যে আত্মাকেই অবলোকন করেন, তিনি কখনও কাউকে ঘৃণা করতে পারেন না। কারণ, যখন জ্ঞানীর চেতনায় সমস্ত সত্তাই নিজের আত্মাতেই অবস্থান করে, তখন ভেদবুদ্ধি বিলীন হয়। সবকিছুই যখন আত্মস্বরূপ হয়ে ওঠে, তখন তিনি কাকেই বা ঘৃণা করবেন, আর কার জন্যই বা শোক করবেন?

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

(শুক্ল যজুর্বেদ-ঈশোপনিষদ-৬ষ্ঠ এবং ৭ম মন্ত্র)

সরলার্থ:- যিনি সকল ভূতকে আত্মাতেই দেখেন এবং সমুদয় ভূতে নিজ আত্মাকে দেখেন, তিনি উক্ত অনুভূতির ফলে কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যে কালে বা যে আত্মাতে সমস্ত দেহ জ্ঞানীর আত্মাই হইয়া যায়, আত্মৈকদর্শী সেই জ্ঞানীর সেই কালে বা সেই আত্মাতে মোহই বা কি, আর শোকই বা কি অর্থাৎ শোক মোহ কিছু থাকে না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—যে কর্মযোগী জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধচিত্ত এবং "সর্বভূতাত্মভূতাত্মা", অর্থাৎ যিনি সকল প্রাণীর আত্মরূপ পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্যসাধন করেছেন, তিনি কর্মে নিযুক্ত থাকলেও তাতে লিপ্ত হন না। এই শ্লোকে দুটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষণীয়। প্রথমত, গীতা এখানে স্পষ্ট করে জানাচ্ছে যে সমস্ত জীবের আত্মা আসলে সেই এক পরমাত্মাই। দ্বিতীয়ত, "পরমাত্মাতে একীভাববিশিষ্ট হয়ে থাকা"—অর্থাৎ নিজের অন্তরের আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নরূপে অনুভব করা—এটাই অদ্বৈত বেদান্তের মূল তত্ত্বের প্রতিফলন।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৫/৭)

সরলার্থ:- শরীর বশকারী জিতেন্দ্রিয়, (আর) বিশুদ্ধান্তঃকরণ (এবং) সমস্ত প্রাণীর আত্মরূপ পরমাত্মাতে একীভাববিশিষ্ট নিষ্কাম কর্মযোগী কর্মে সংযুক্ত হয়েও (তাতে) লিপ্ত হন না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার জ্ঞানযোগ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটি শ্লোকে সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শনের শিক্ষা দিয়েছেন, যেখানে যজ্ঞের প্রতিটি উপাদানেই পরমতত্ত্বের প্রতিফলন দেখানো হয়েছে। তিনি বলেছেন—যজ্ঞে হবি অর্পণকারী, হব্যদ্রব্য, যজ্ঞকর্তা, অগ্নি এবং যজ্ঞকর্ম—সবই ব্রহ্মস্বরূপ। অর্থাৎ, যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠ, তিনি সর্বত্র ও সর্ববস্তুর মধ্যে সেই এক পরমসত্তা ব্রহ্মকেই প্রত্যক্ষ করেন। এই শিক্ষা অদ্বৈত বেদান্তের মূল মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি—সমস্ত জগৎই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। গীতার এই শ্লোকে সেই একত্ববোধের তত্ত্ব স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৪/২৪)

সরলার্থ:- অর্পণ অর্থাৎ স্রুবাদি যার দ্বারা হবি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়(ও) ব্রহ্ম, (এবং) হবি অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্য(ও) ব্রহ্ম আর ব্রহ্মরূপ কর্তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোম করা যায় (তাও ব্রহ্মই—এই নিমিত্ত) ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাধিস্থ সেই পুরুষদ্বারা (যা) পাবার যোগ্য (তাও) ব্রহ্ম ই (হয়)॥

সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শনের তত্ত্ব শ্রুতিতেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে—এই সমগ্র জগৎ স্বরূপতই ব্রহ্ম, এবং এই সত্য উপলব্ধি করে দৃঢ় প্রত্যয়ে স্থিত হওয়াই জ্ঞানীর কর্তব্য।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপসীত।

অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে
পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্বীত॥

(সামবেদ-ছান্দোগ্য উপনিষদ-৩/১৪/১)

সরলার্থ:- এই সমস্ত জগৎ স্বরূপ ব্রহ্মই; কারণ তাঁহা হইতেই উহা জাত হয়, তাঁহাতে লীন হয় ও তাঁহাতে জীবিত থাকে। অতএব, শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে; (অর্থাৎ) মানুষ যেহেতু ভাবরূপী, সে জীবিতাবস্থায় যেরুপ নিশ্চয়শীল হয়, দেহত্যাগের পর সেইরূপই হইয়া থাকে, (অতএব) সে (এই তত্ত্ব জানিয়া) দৃঢ় প্রত্যয় অবলম্বন করিবে (তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া রূপ উপাসনা অবলম্বন করিবে)।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানবদেহ ও আত্মার সম্পর্কের এক গভীর সত্য উন্মোচন করেছেন। তিনি বলেছেন— এই দেহটিই ক্ষেত্র, অর্থাৎ কর্ম ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র; আর যিনি এই দেহকে জানেন, যিনি এর কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ জীবাত্মা। এরপর ভগবান প্রকাশ করেন আরও গভীর এক তত্ত্ব—তিনি বলেন, সকল ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ তিনিই, অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের দেহে যে সচেতন সত্তা বিরাজমান, সেই পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে অবস্থান করছেন। এই উক্তি গীতার অদ্বৈত ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলে। কারণ, এখানে জীব ও পরমাত্মার পৃথকত্ব অস্বীকার করে একত্বের তত্ত্বই প্রতিপন্ন হয়েছে—যা অদ্বৈত বেদান্তের মূল দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৩/১-২)

সরলার্থ:- হে অর্জুন! এই শরীর ক্ষেত্র এইরকম কথিত হয়, এটিকে যে জানে, তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ এইরকম উহার তত্ত্বজ্ঞানীরা বলে থাকেন। এবং হে অর্জুন! (তুমি) সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মাও আমাকে(ই) জান (আর) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ বিকারসহ প্রকৃতি এবং পুরুষের যে তত্ত্বতঃ জ্ঞান তাই জ্ঞান (পরমজ্ঞান) —এরকম আমার মত।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের তিনটি প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—বিবৃত করেছেন। এর মধ্যে সাত্ত্বিক ও রাজসিক জ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি জ্ঞানের প্রকৃত দিকনির্দেশ দিয়েছেন। ভগবান বলেন—যে জ্ঞান দ্বারা সাধক সকল প্রাণীতে একই অবিনাশী আত্মাকে উপলব্ধি করেন, সেই জ্ঞানই সত্য ও সাত্ত্বিক। অন্যদিকে, যে জ্ঞান দ্বারা সর্বভূতে পৃথক পৃথক আত্মার ধারণা সৃষ্টি হয়, তা রাজসিক জ্ঞান।

অতএব, এখানে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, অদ্বৈত বেদান্তের সর্বভূতে এক আত্মদর্শনের তত্ত্বকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্ত্বিক জ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥
(শ্রীমদ্ভগবদগীতা–১৮/২০-২১)

সরলার্থ:- যে জ্ঞান দ্বারা অব্যক্ত হইতে স্থাবর পর্যন্ত বহুধা বিভক্ত সর্বভূতে এক অবিভক্ত অক্ষর আত্মবস্তু দৃষ্ট হন, সেই অদ্বৈত আত্মদর্শনরূপ সম্যক জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে। কিন্তু যে জ্ঞান দ্বারা প্রতিদেহে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত সকল প্রাণি-শরীরে পরস্পর বিলক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন আত্মার দর্শন হয়, তাহা রাজসিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে॥

এবার একটি সংশয়ের উত্তর খোঁজা যাক। শ্রীমদ্ভগবদগীতার এক শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— "আমারই সনাতন অংশ জীবরূপে প্রকৃতিতে অবস্থান করে।" এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদয় হয়— যদি জীবাত্মাই স্বয়ং পরমাত্মা হন, তবে তাঁকে 'পরমাত্মার অংশ' বলা হলো কীভাবে? পরমাত্মা তো স্বরূপতই অখণ্ড, অবিকার ও অংশরহিত! তাহলে এখানে 'অংশ' শব্দের অর্থই বা কী? এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত শ্লোকের ব্যাখায় শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমে শ্লোকটি উল্লেখ করে এর উপর জগদীশচন্দ্র ঘোষের ব্যাখার কিয়দংশ উল্লেখ করছি।



মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠীনীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
(শ্রীমদ্ভগবদগীতা–১৫/৭)

সরলার্থ:- এই দেহে এই জীবাত্মা আমারই সনাতন অংশ (এবং সে এইসব) ত্রিগুণময়ী মায়াতে স্থিত মনের সঙ্গে পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করে॥

উক্ত শ্লোকের ব্যাখায় শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ 'শ্রীগীতা' গ্রন্থে বক্তব্য এরুপ— "জীব আমার সনাতন অংশ। এ অংশ কীরুপ? অদ্বৈতবাদী বলেন— ব্রহ্ম অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্নহ নিরবয়ব অদ্বয় বস্তু, উহার খণ্ডিত অংশ কল্পনা করা যায় না। এ স্থলে 'অংশ' বলিতে এইরুপ বুঝিতে হইবে—যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদি মহাকাশের অংশ। ঘটের বা মঠের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহাকে মহাকাশের অংশ বলা যায়, ঘট বা মঠ ভাঙ্গিলে এক অপরিচ্ছিন্ন আকাশই থাকে। জীবেরও দেহোপাধিবশতঃ ব্রহ্ম হইতে পার্থক্য, দেহোপাধিনাশে এক অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মসত্তাই অবশিষ্ট থাকে।"

অর্থাৎ 'অংশ' শব্দটি প্রকৃত অর্থে দেহোপাধিজনিত সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত। ব্রহ্ম খণ্ডিত নন; জীব কেবল উপাধির সীমারেখায় পৃথক বলে প্রতীয়মান হন। অতএব, গীতার এই শ্লোকে 'মমৈবাংশঃ' বলে ভগবান আসলে অদ্বৈততত্ত্বকেই ইঙ্গিত করেছেন—

জীবাত্মা ও পরমাত্মা তত্ত্বতঃ একই চেতনসত্তা, উপাধিমাত্রই বিভেদের কারণ।

অদ্বৈতবিরোধী অনার্ষগণ বলে থাকে, শ্রীমদ্ভগবদগীতায় কিংবা অন্যান্য শাস্ত্রে অদ্বৈতবোধক বাণী যেখানে পাওয়া যায়, তা আসলে রূপক বা কেবল তাদাত্ম্যময় অবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শ্রুতি স্পষ্টভাবে অদ্বৈত তত্ত্বেরই উপদেশ দিয়েছে যার প্রমাণ পূর্বেই দেখানো হয়েছে। অতএব, অদ্বৈতবোধ কোনো কল্পনামাত্র তাদাত্ম্য বা ক্ষণিক মানসিক অনুভূতি নয়; বরং এটি জীবের প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি, যেখানে সে জ্ঞানের আলোয় প্রত্যক্ষ করে— সে নিজেই সেই পরম চেতনসত্তা তথা পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন এক অখণ্ড সত্তা।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা দর্শনের এক বিশাল সমন্বয়ক্ষেত্র, যেখানে কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানের নানা ধারা মিলেমিশে পরমসত্যের একক উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হয়েছে। গীতার বিভিন্ন শিক্ষা কখনও ভিন্ন ভিন্ন পথের প্রতিফলন ঘটালেও, এর অন্তর্নিহিত সাধনপ্রবাহ ক্রমে যে অদ্বৈত চেতনার জগতে পৌঁছে দেয়, সেখানে সমস্ত ভেদ ও বিভেদ

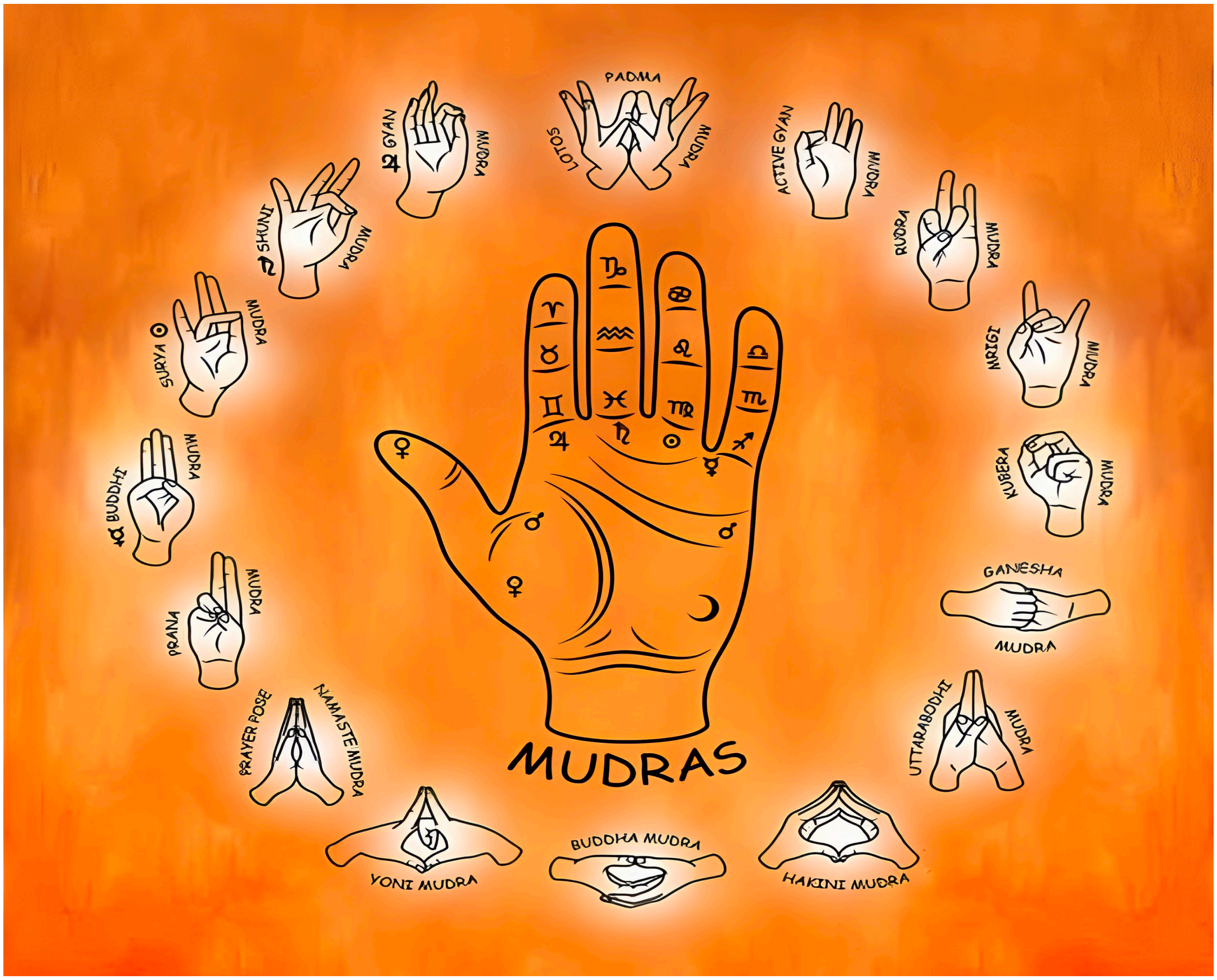
বিলীন হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে জীব ধীরে ধীরে আত্মোপলব্ধির সেই চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়, যেখানে সে নিজেকে পরমচৈতন্যেরই প্রকাশরূপে অনুভব করে। এই উপলব্ধিতেই গীতার দার্শনিক যাত্রা পরিণতি লাভ করে—অখণ্ড, অবিভক্ত, সর্বব্যাপী চেতনার সেই অভ্যন্তরীণ জ্ঞানেই গীতার অন্তিম দর্শন সার্থক হয়।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রীশ্রী চণ্ডী - স্বামী জগদীশ্বরানন্দ - উদ্বোধন কার্যালয়
২. উপনিষদ - স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
৩. শ্রীমদ্ভগবদগীতা - জয়দয়াল গোয়েন্দকা - গীতাপ্রেস
৪. ঈশোপনিষদ - স্বামী জুষ্টানন্দ - উদ্বোধন কার্যালয়
৫. উপনিষদ গ্রন্থাবলী - স্বামী গম্ভীরানন্দ - উদ্বোধন কার্যালয়
৬. শ্রীমদ্ভগবদগীতা - স্বামী জগদীশ্বরানন্দ - উদ্বোধন কার্যালয়
৭. শ্রীগীতা - শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

মুদ্রা প্রকরণঃ দেব ভাষার এক অনন্য প্রকাশ

সুকান্ত চক্রবর্তী



ভাষা সৃষ্টির আগে অঙ্গভঙ্গীই ছিল আদিম মানুষের মনোভাব প্রকাশের মুখ্য উপায়। বর্তমান কালেও শব্দসম্পদহীন বন্য জাতিগুলির মধ্যে মুখের ভাষার পাশাপাশি অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করার চল বেশি। এ প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্যণীয় মূক- বধির ব্যক্তিগণের নিজেদের মধ্যে তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশের ইঙ্গিতবাহী ক্রিয়াগুলি।

অঙ্গভঙ্গীর শক্তি বাস্তবিকই বিস্ময়কর। অনেক বাক্য ব্যয় করেও যে মনোভাবটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় না, শরীরের একটি ছোট্ট ভঙ্গীর দ্বারা সেটি সহজেই জানা বা জানানো যায়।

বিজ্ঞান মানুষকে 'মনোজৈবিক' প্রাণী বলেছে অর্থাৎ, মানুষ এমন প্রাণী যে একাধারে জীবনধর্মীও বটে আবার মনোধর্মীও বটে। প্রাণধর্মের তাগিদে মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের মতই সহজাত প্রাকৃতিক নিয়মে আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রজননে ব্যস্ত থেকেছে আবার, একই সঙ্গে মনোধর্মের কারণে মানুষ তার পারিপার্শ্বিককে জানতে, চিনতে ও বুঝতে চেয়েছে এবং ক্রমে ভাষার সাহায্যে স্বজনের কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতেও শিখেছে। কিন্তু তার আগে অর্থাৎ, কথার ব্যবহারের আগে? তখন তার সহায় ছিল শুধুমাত্র কিছু আওয়াজ ও অঙ্গভঙ্গী। অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যেই আদিম মানুষ ব্যক্ত করত, কোথায় খাদ্য পাওয়া যাবে, কেথায় মিলবে সুরক্ষিত আশ্রয় কিংবা তার রাগ, দুঃখ, ভাললাগা-মন্দলাগা, তার কষ্ট, আনন্দ, সবকিছুই।

পরবর্তীকালে ভাষার সাহায্যে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা বাড়লেও ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতবাহী অঙ্গভঙ্গীর ব্যবহারে মানুষ

ছেদ টানেনি। বর্তমানেও, মানব সভ্যতার চরম উৎকর্ষের সময়েও আঙ্গিক, সাত্ত্বিক ও আবেগিক আচরণ অন্তরের ভাব প্রকাশের ব্যাপারে মানুষের বড় সহায়। অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা মনোভাব প্রকাশের এই ধারাটিই যুগ- যুগান্তরে পরিশীলিত হয়ে ক্রমবিবর্তনের ফলে আজকের মুদ্রায় পরিণত হয়েছে।

'মুদ্রা' শব্দটির অর্থানুসন্ধানে পাওয়া যায়,–মুদম্ (আনন্দং) রতি (দদাতি)–অর্থাৎ যা আনন্দ দান করে পক্ষান্তরে, আনন্দ মুদ্রণ করে বলেই একে মুদ্রা বলা হয়-

"মুদ্রয়তে লক্ষণেনেতি মুদ্রণং তেন ভন্যতে।"

মানবের দেহে ও মনে যে অনন্ত শক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে, তাকে জাগ্রত করা, সে শক্তির আয়ত্তীকরণ, শক্তি আর শক্তিমানের সামঞ্জস্য বিধান করা, এ সকল সাধনার অন্যতম অঙ্গ মুদ্রা। যৌগিক, মান্ত্রিক, তান্ত্রিক, শারীরিক ইত্যাদি এবং হাব-ভাব প্রকাশক বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা আছে। এদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে স্থুল, সূক্ষ্ম ও সাঙ্কেতিক অর্থের ব্যাখ্যাও উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। শুধুমাত্র হস্তাঙ্গুলির বিভিন্ন প্রকার সন্নিবেশ, দেহের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী ও সঞ্চালন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সঙ্গ চিহ্নই মুদ্রার শেষ কথা নয় পরন্তু, ভারতীয় সাধন পদ্ধতির গভীর রহস্য ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতীক রূপেই মুদ্রাকে গ্রহণ করতে হবে।

ভারত ভূখণ্ডে ধর্ম, সম্প্রদায় ও মত নির্বিশেষে ধর্মসাধন ক্ষেত্রে সকল পদ্ধতিতেই মুদ্রার বিধান আছে। মুদ্রার বাহ্যিক ও তাত্ত্বিক রূপের মধ্যে পার্থক্য আছে। যথার্থ স্বরূপে মুদ্রা কোন বাহ্যিক বা কর্মকাণ্ডীয় ক্রিয়া নয়। মুদ্রা মূলতঃ সাধকের চিদানন্দাত্মক আত্মস্বরূপ উন্মীলনের সাধনা- শুধুমাত্র সাধনাই নয়, এ হল সাধকের হৃদয়ের অন্তরতম অংশে অধিষ্ঠিত শিব-শক্তির বিকাশ।

মালিনীবিজয়োত্তরতন্ত্রে শিব-শক্তিকে মুদ্রা বলা হয়েছে।

"অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মুদ্রাখ্যোঃ শিবশক্তয়ঃ"

(মালিনীবিজয়োত্তরতন্ত্র, অঃ ৭)

বর্তমান যুগে পৃথিবীর তথা ভারতের এক বিরাট অংশে মান্ত্রিক, যৌগিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধিক, শারীরিক, নান্দনিক ইত্যাদি বহু প্রকার মুদ্রার প্রচলন আছে। বলা যায়, মুদ্রার ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়েই প্রচলিত আছে। ভারতে প্রাচীন যুগে প্রধানতঃ শারীরিক, যৌগিক, তান্ত্রিক, মান্ত্রিক, বৌদ্ধিক ও বিনোদনমূলক নৃত্য-নাট্য সংক্রান্ত মুদ্রার বিকাশ ঘটে।

যৌগিক মুদ্রা-

যোগ সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ মুদ্রা। মুদ্রা কেবলমাত্র অঙ্গ সঞ্চালন বা বিশেষ ধরণের অঙ্গুলিবিক্ষেপ নয় পরন্তু, যোগ সাধনার ক্ষেত্রে আসন বা প্রাণায়াম অপেক্ষা এর গুরুত্ব সমধিক। কারণ মুদ্রার তাত্ত্বিক রূপটি বহুব্যাপক ও অত্যন্ত রহস্যময়। যোগ সাধনার ক্ষেত্রে মুদ্রা কোন বাহ্যিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত ব্যাপার নয় বরঞ্চ, একে মূলতঃ সাধকের নিজের চিদানন্দাত্মক আত্মস্বরূপ উন্মোচনের সহায়ক এক সাধন পদ্ধতি বলা যায়। যোগশাস্ত্রোক্ত মুদ্রাগুলি প্রধানতঃ– মহামুদ্রা, মহাবন্ধমুদ্রা, মহাবেধমুদ্রা, খেচরীমুদ্রা, উড্ডীয়ানমুদ্রা, মূলবন্ধমুদ্রা, জালন্ধরবন্ধমুদ্রা, বিপরীতকরণীমুদ্রা, বজ্রোলীমুদ্রা, শক্তিচালনীমুদ্রা, নভোমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, তড়াগীমুদ্রা, মাণ্ডবীমুদ্রা, শাম্ভবীমুদ্রা, অশ্বিনীমুদ্রা, পাশিনীমুদ্রা, কাকীমুদ্রা, মাতঙ্গীমুদ্রা, ভুজঙ্গিনীমুদ্রা, পঞ্চধারিণী মুদ্রা ইত্যাদি।

তান্ত্রিক মুদ্রা-

তন্ত্রোক্ত মুদ্রাগুলি প্রধানত— ত্রিখণ্ডমুদ্রা, সর্বসংক্ষোভকারিণীমুদ্রা, সর্ববিদ্রাবিণীমুদ্রা, সর্ববশঙ্করীমুদ্রা, আকর্ষণীমুদ্রা, উন্মাদিনীমুদ্রা, মহাঙ্কুশামুদ্রা, খেচরীমুদ্রা, সময়মুদ্রা, সংহারমুদ্রা, বীজমুদ্রা, যোনিমুদ্রা ইত্যাদি।

মান্ত্রিকমুদ্রা-

সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি মান্ত্রিক মুদ্রার সহায়তার দ্বারাই লভ্য হয়।

"যাভিঃ সংরক্ষিতো মন্ত্রী মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।"

(মালিনীবিজয়োত্তরতন্ত্র, অধি- ৭.১)

মুদ্রা যেমন দেবতাদের আনন্দিত করে, তেমনই সাধকের মনকে দ্রবীভূত ও করে।—

"মুদ্রং কুর্বন্তি দেবানাং মনাংসি দ্রাবয়ন্তি চ।
তস্মান্মুদ্রা ইতি খ্যাতা দর্শিতব্যাঃ কুলেশ্বরি।।"—(কুলার্ণবতন্ত্র)।

শারীরিক মুদ্রা-

স্বাস্থ্য ও রোগোপচারের মুদ্রাগুলি প্রধানত—

ধ্যানমুদ্রা, বায়ুমুদ্রা, শূন্যমুদ্রা, পৃথ্বীমুদ্রা, বরুণমুদ্রা, সূর্য্যমুদ্রা, প্রাণমুদ্রা, লিঙ্গমুদ্রা। এই মুদ্রাগুলি বর্তমানে বহুল প্রচারিত। এর অতিরিক্ত আরো অনেক প্রকার মুদ্রা আছে।প্রত্যেক বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতি এবং তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ অনুসারে মুদ্রার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়।

নান্দনিক মুদ্রা-

গন্ধর্বশাস্ত্রে নৃত্যের বিশেষ বর্ণনা আছে। নৃত্যের সাথে সাথে নর্ত্তক বিভিন্ন ভঙ্গিমার দ্বারা তাঁর মনোভাব বা বক্তব্য প্রকটিত করেন এবং বাহ্য দৃশ্য, বিভিন্ন মনের ভাব, মানসিক স্থিতি, ভাবোদ্বেগ ও রসানুভূতি দর্শকবৃন্দের কাছে পরিস্ফুট তোলেন।

মুদ্রার প্রকারভেদ অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গন্ধর্ব শাস্ত্রে মুদ্রাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) মনোজা (২) বাগ্‌ভবা (৩) দেহোদ্ভবা।

তন্ত্রালোকে আচার্য অভিনবগুপ্তপাদ বলেছেন,

"মনোজা গুরুবক্ত্রস্থা বাবা মন্ত্রসম্ভবা। দেহোদ্ভবাঙ্গবিক্ষেপমুদ্রেয়ং ত্রিবিধা স্মৃতা।।"

মনোজা মুদ্রা মানসিক অনুসন্ধান থেকে, বাগভবা মুদ্রা মন্ত্র দ্বারা উদ্ভূত হয়ে এবং দেহোদ্ভবা মুদ্রা দেহের নানা অঙ্গবিক্ষেপাত্মক বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমাদ্বারা প্রকটিত হয়।

আচার্য অভিনবগুপ্তপাদের মতে শরীর, মন এবং বাণী, এই তিনটির সংযোগেই মুদ্রা প্রদর্শন করা উচিত।

"মুদ্রাপ্রদর্শনং পশ্চাৎ কায়েন মনসা গিরা।"

(তন্ত্রালোক, ১৫/১৫৮)।

অর্থাৎ, মুদ্রায় কায়—মন—বাক্যের সমাবেশ হয়।

মুদ্রা সম্বন্ধে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, মুদ্রার অভ্যাসের দ্বারা দেহের সুত্র ও দেহবদ্ধ শক্তির আবির্ভাব হয়।

বৌদ্ধিক মুদ্রা—

ধর্ম এবং মত অনুসারে মুদ্রার বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি হয়েছে। যথা, সাধকদের অনুসৃত কুর্মমুদ্রা, ধর্মমুদ্রা, জ্ঞানমুদ্রা এবং মহামুদ্রার উল্লেখ করা যেতে পারে, এছাড়া আরও মুদ্রা আছে। অদ্বয়বজ্রসংগ্রহমতে সময়মুদ্রাই শ্রেষ্ঠতম। ঋষি সরহপা 'ভবমুদ্রা' নামে পৃথক একটি মুদ্রার উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী বোধিচিত্ত উদ্বুদ্ধ হওয়ার পর উক্ত চারটি মুদ্রা মোক্ষপ্রদ হয়। শ্রীসম্পুটের মতে লোচনা মামকীমুদ্রা, পাওরামুদ্রা এবং তারামুদ্রা যথাক্রমে কর্মমুদ্রা, জ্ঞানমুদ্রা, মহামুদ্রা ও সময়মুদ্রার নামান্তর। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মতে মুদ্রা মোদ অর্থাৎ আনন্দ প্রদান করে। দেব দেবী পূজায় মুদ্রা প্রদর্শন এর কোনো বিকল্প নেই।তাই পৌরোহিত্য তে নিযুক্ত সবারই এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত।

তথ্যসূত্র:
১.শৈবাগম তন্ত্রসাধনা-দিব্যবন্ধু
২.সচিত্র পূজার্চ্চনায় মুদ্রা।-শ্রী শচীনাথ চট্টোপাধ্যায়
৩.বৃহৎ মুদ্রাবিজ্ঞান-অজয় কুমার ভাণ্ডারী
৪.শৈবতন্ত্র ও বৈদিক ধর্মের স্রোতধারা- প্রবীর চট্টোপাধ্যায়।



ক্ষমার প্রশংসা

সবুজ চন্দ্র রায়

মহাভারত (বন পর্ব)

বৈশম্পায়ন বললেন-জনমেজয়! একদিন সন্ধ্যার সময় বনবাসী পাণ্ডবরা কিছু দুঃখিত চিত্তে দ্রৌপদীর সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। কথায় কথায় দ্রৌপদী বললেন দুর্যোধন সত্যিই বড় ক্রুর এবং দুরাত্মা। আমাদের দুঃখী দেখে তার একটুও কষ্ট হয়নি। হায়! আমাদের মৃগচর্ম পরিয়ে বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে পাঠিয়ে ওর একটুও কষ্ট হয়নি। তার হৃদয় নিশ্চয়ই পাথরের তৈরি। এক তো কপটদ্যুতে আমাদের হারিয়েছে, তারপরে আপনার মতো সরল এবং ধর্মাত্মা ব্যক্তিকে পূর্ণ সভাস্থলে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করে এখন বন্ধুদের সঙ্গে মজা করছে। আমি যখন দেখি যে, আপনারা সুন্দর পালঙ্কের শয্যা ছেড়ে কুশের বিছানায় শয্যাগ্রহণ করেন, তখন আমার হাতির দাঁতের সিংহাসনের কথা মনে পড়ে আর কান্না পায়। বড় বড় নৃপতিরা আপনাকে ঘিরে থাকতেন, আপনারা চন্দনচর্চিত হয়ে থাকতেন। এখন আপনারা একা একা জঙ্গলে রুগ্ন, নোংরাভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমি কী করে শান্তি পাব! আপনার মহলে প্রত্যহ হাজার হাজার ব্রাহ্মণদের ভোজন করানো হত আর আজ আমরা ফলমূল খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করছি। প্রিয় স্বামী, ভীমকে বনবাসী এবং দুঃখী দেখে আপনার চিত্তে ক্রোধ আসছে না? ভীম একাই রণভূমিতে সমস্ত কৌরবদের নিহত করতে সক্ষম। কিন্তু আপনাকে চুপ করে থাকতে দেখে মন খারাপ করে বসেছিলেন। দুই বাহু সমন্বিত হয়েও অর্জুন হাজার হস্ত সম্বলিত কার্তবীর্য অর্জুনের সমান বলশালী। তাঁর অস্ত্র-কৌশলে চমকিত হয়েই বড় বড় রাজারা আপনার চরণে প্রণাম করে আপনার যজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন। সেই দেবতা ও দানবদের পূজনীয় পুরুষসিংহ আজ বনবাসী হয়ে রয়েছেন। আপনার চিত্তে ক্রোধের উদয় হয় না? শ্যামল বর্ণ, বিশাল দেহ, হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে বীরত্বের দেবতা, সেই নকুল ও সহদেবকে বনবাসী দেখে আপনি কেন চুপ করে আছেন? রাজা দ্রুপদের কন্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী এবং পাণ্ডবদের পতিব্রতা পত্নী আমি আজ বনে পথভ্রান্তের মতো ঘুরে মরছি। ধন্য আপনার সহ্যের শক্তি! আপনার মধ্যে ক্রোধ নেই। যার মধ্যে ক্রোধ এবং তেজ নেই, সে কেমন ক্ষত্রিয়? যে ঠিক সময়ে তার তেজ দেখায় না, তাকে সকল প্রাণীই অপমান করে। শত্রুদের সঙ্গে ক্ষমা নয়, শৌর্যপূর্ণ ব্যবহারই করা উচিত।

দ্রৌপদী আবার বলতে লাগলেন- 'রাজন্! পূর্বে রাজা বলি তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- 'পিতামহ!

ক্ষমা উত্তম, না ক্রোধ? আপনি আমাকে ঠিক মতো বুঝিয়ে দিন।' প্রহ্লাদ বলেছিলেন - 'পরিস্থিতি বিশেষে ক্ষমা এবং ক্রোধ দুইয়েরই সমান প্রয়োজন। সবসময় ক্রোধ করাও উচিত নয়, ক্ষমা করাও নয়। যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা করে থাকেন, তাকে তার পুত্র, দাস, সেবক এবং উদাসীন ব্যক্তিরাও কটুকথা বলে অপমান করতে থাকেন, অবজ্ঞা করেন। ধূর্ত ব্যক্তিরা ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে দমন করে তার স্ত্রীকেও আত্মসাৎ করতে চায়। নারীরাও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে এবং পতিব্রতা ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া যে ব্যক্তি কখনো ক্ষমা করে না, সব সময় ক্রোধ করে, ক্রোধের জন্য বিনা বিচারে সকলকে দণ্ড দেয়, সে মিত্রদের বিরোধী এবং আত্মীয়স্বজনের শত্রু হয়ে ওঠে। সবদিক থেকে অপমানিত হওয়ায় তার ধনহানি হয় এবং ধিক্কার লাভ হয়। তার মনে তখন সন্তাপ, ঈর্ষা এবং দ্বেষভাব বাড়তে থাকে। এর জন্য তার শত্রুবৃদ্ধি হয়। সে ক্রোধভাবে অন্যায়পূর্বক কাউকে দণ্ড দিলে তাকে ঐশ্বর্য, স্বজন এবং নিজের প্রাণও হারাতে হয়। যে সবসময় ক্রোধ ও অহংকার করে, তাকে লোকে ভয় পায়, তার ভালো করতে কুণ্ঠিত হয় এবং তার কোনো দোষ দেখলে সকলকে বলে বেড়ায়। তাই সবসময় উগ্র ব্যবহারও করতে নেই আবার সরল ব্যবহারও করতে নেই। সময়ানুসারে উগ্র বা সরল ব্যবহার করতে হয়। যে ব্যক্তি সময় অনুসারে সরল ও উগ্র ব্যবহার করেন, তিনি ইহলোকে শুধু নয় পরলোকেও সুখভোগ করেন।' এবার আমি আপনাকে ক্ষমা কখন করবেন, তা বলছি। যদি কোনো ব্যক্তি প্রথমে আপনার কোনো উপকার করে থাকে, তারপর তার দ্বারা কোনো বড় অপরাধ সংঘটিত হয় তবে আগের উপকারের কথা মনে রেখে তাকে ক্ষমা করে দিতে হয়। কোনো ব্যক্তি যদি মূর্খতাবশত অপরাধ করে ফেলে, তাহলে তাকেও ক্ষমা করা উচিত। কারণ সকলেই সব কাজে পারদর্শী হয় না। অন্যদিকে যে লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করে এবং বলে 'আমি না জেনে করে ফেলেছি' সেই ব্যক্তিকে সামান্য অপরাধেও পুরো সাজা দেওয়া উচিত। কুটিল ব্যক্তিদের কখনো ক্ষমা করতে নেই। প্রথম বারের অপরাধ সকলেরই ক্ষমা করা যায়, কিন্তু দ্বিতীয়বার হলে অবশ্যই দণ্ড দিতে হয়। মৃদুতার দ্বারা উগ্র ও কোমল উভয় প্রকারের লোককেই বশ করা যায়। মৃদু স্বভাব ব্যক্তির পক্ষে কোনো কিছুই অসাধ্য নয়। তাই মৃদুতাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সুতরাং দেশ, কাল, সামর্থ্য এবং দুর্বলতার ওপর পুরোপুরি বিচার করে মৃদুতা এবং উগ্রতার ব্যবহার করা উচিত। কখনো কখনো ভয়েও ক্ষমা করতে হয়। কেউ এর অন্যথা করলে ক্রোধপূর্ণ ব্যবহার করতে হয়।' দ্রৌপদী আরও বললেন- 'রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা পরপর অপরাধ করে যাচ্ছে, তাদের লোভও অসীম। আমার মনে হয় এখন ওদের ওপর ক্রোধ প্রকাশের সময় হয়েছে। আপনি ওদের আর ক্ষমা না করে, সাজা দিন।

যুধিষ্ঠির বললেন- 'প্রিয়ে। ক্রোধের বশ না হয়ে, ক্রোধকে নিজের বশে রাখা উচিত। যে ব্যক্তি ক্রোধ জয় করেছে, সে কল্যাণভাজন হয়। ক্রোধের জন্য মানুষের বিনাশ হয়, তা প্রত্যক্ষ। আমি কী করে ক্রোধের বশ হয়ে অবনতির হেতু হব? ক্রুদ্ধ ব্যক্তি পাপ করে, গুরুজনকে মারে, মহৎ ব্যক্তি এবং কল্যাণকারক বস্তুকেও তিরস্কার করে, ফলে সে বিপদে পড়ে। ক্রোধী ব্যক্তি বুঝতে পারে না তার কী করা উচিত আর কী নয়। যা মনে আসে বলে যায়। সে যোগ্য ব্যক্তিকে অসম্মান করে আর অযোগ্য ব্যক্তির সম্মান করে, পরে ক্রোধের বশে আত্মহত্যা করে সে নরকে গমন করে। ক্রোধ হল দোষের আবাস। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের উন্নতি, পারলৌকিক সুখ এবং মুক্তিলাভ করার জন্য ক্রোধ জয় করে। ক্রোধের অগুণতি দোষ। তাই এই সব ভেবে চিন্তে আমার চিত্তে ক্রোধের উদয় হয় না। যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ওপরেও রাগ করে না, ক্ষমা করে, সে নিজে এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করে। সে দুজনেরই রোগ মুক্তিকারী চিকিৎসক। মিথ্যা বলার থেকে সত্য বলা কল্যাণকর। ক্রুরতার থেকে কোমলতাই উত্তম। ক্রোধের থেকে ক্ষমার স্থান উচ্চে। দুর্যোধন যদি আমাকে হত্যাও করে তাহলেও আমি নানা দোষ পরিপূর্ণ এবং মহান বাক্তিদের পরিত্যক্ত ক্রোধকে আপন করে নেব না। যিনি নিজ ক্রোধকে জ্ঞানদৃষ্টিতে শান্ত করে নেন, তাঁকেই তেজস্বী বলে জানবে। ক্রোধী ব্যক্তি যখন নিজ কর্তব্য ভুলে যায়, তখন তার কর্তব্য এবং মর্যাদার জ্ঞান থাকে না। সেই ব্যক্তি অবধ্য প্রাণীদেরও মেরে ফেলে, গুরুজনদের মর্মভেদী বাকা বলে তাই, যদি নিজের মধ্যে ক্ষমতা (তেজ) থাকে, তবে নিজ ক্রোধকেই বশীভূত করতে হয়। কাজ করার কৌশল, শত্রুদের পরাজিত করার চিন্তা, বিজয় লাভের শক্তি এবং স্ফূর্তিই হল তেজস্বীদের গুণ। ক্রোধী ব্যক্তিদের এই গুণ থাকে না। ক্রোধ ত্যাগ করলে তবেই এটি লাভ করা যায়। ক্রোধ রজোগুণের পরিণাম হওয়ায় মানুষের মৃত্যুর কারণ। তাই ক্রোধ পরিত্যাগ করে শান্ত হতে হয়। নিজ ধর্ম থেকে একবার সরে যাওয়াও শ্রেয়, কিন্তু ক্রোধ করা কখনোই ভালো নয়। আমি মূর্খদের কথা বলছি না, বুদ্ধিমান মানুষ কখনো ক্ষমাকে পরিত্যাগ করে না। মানুষের মধ্যে যদি ক্ষমাশীলতা না থাকে তাহলে সকলেই একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে মরবে। একজন দুঃখী অন্যজনকে দুঃখ দেবে, দণ্ডদানকারী গুরুজনদেরও মারতে উদ্যত হবে, তাহলে তো কোনো ধর্মই থাকবে না, প্রাণীও নাশ হয়ে যাবে। সেই অবস্থায়

কী হবে? গালাগালের পরিবর্তে গালি, মারের বদলে মার, অপমানের প্রতিশোধ অপমানে। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে শেষ করে দেবে। কোনো মর্যাদা, কোনো সুব্যবস্থা, কোনো সৌহার্দ থাকবে না। যে ব্যক্তি গালি দিলেও, মারলেও ক্ষমা করে, নিজ ক্রোধকে বশীভূত করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বিদ্বান। ক্রোধী ব্যক্তি মূর্খ হয়, নরকগামী হয়। মহাত্মা কাশ্যপ এই সম্পর্কে ক্ষমাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষমাসাধনের কথা বলেছেন - ক্ষমা ধর্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ, ক্ষমা স্বাধ্যায়। যে ব্যক্তি ক্ষমার এই সর্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ জানেন, তিনি সব কিছু ক্ষমা করতে পারেন। ক্ষমা সত্য, ক্ষমাই ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপ, ক্ষমা পবিত্র, ক্ষমাই এই জগৎকে ধারণ করে আছে। যাজ্ঞিকরা যজ্ঞ করে যে লোক প্রাপ্ত হন, ক্ষমাশীল ব্যক্তিরা তার থেকেও উত্তম লোক লাভ করেন। বেদজ্ঞরা, তপস্বীরা এবং কর্মজ্ঞগণ অন্যান্য লোক পেয়ে থাকেন আর ক্ষমাশীলরা ব্রহ্মলোকের শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হন। ক্ষমা হল তেজস্বীদের তেজ, তপস্বীদের ব্রহ্ম এবং সত্যবাদীদের সত্য। ক্ষমাই লোকোপকার, ক্ষমাই শান্তি। সেই ক্ষমাকে আমি কীভাবে ত্যাগ করব? জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বদা ক্ষমা করা উচিত। কোনো ব্যক্তি যখন সব কিছু ক্ষমা করে দেয়, তখন সে স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যায়। ক্ষমাশীলের জন্য ইহলোক ও পরলোক উভয়ই রয়েছে, ইহলোকে সম্মান এবং পরলোকে শুভগতি। যারা ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে দমিত রাখে, তারাই পরমগতি প্রাপ্ত হয়। মহাত্মা কাশ্যপ এইভাবে ক্ষমার মহিমা জানিয়েছেন এই সব শুনে তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ করে ক্ষমা অবলম্বন করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য ধৌম্য, মন্ত্রী বিদুর, কৃপাচার্য, সঞ্জয় এবং মহাত্মা বেদব্যাসও ক্ষমারই প্রশংসা করে থাকেন। ক্ষমা এবং দয়াই জ্ঞানীদের সদাচার, এটিই সনাতন ধর্ম। আমি সত্যের সঙ্গে ক্ষমা এবং দয়া পালন করব।

মীমাংসা দর্শনের অন্তর্লোক

শৌনক রায় চৌধুরী



হিন্দুধর্মের ষড়দর্শনের মধ্যে অন্যতম মীমাংসা দর্শন, বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং তাদের অর্থের অধ্যয়নের উপর কেন্দ্রীভূত। বেদের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত কর্মকাণ্ডকে এই দর্শনে বিশ্লেষণ করে বৈদিক আচারকে দৃঢ়ভিত্তির উপরে স্থাপন করা হয়েছে। ঋষি জৈমিনি মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। এতে মোট সূত্র ২৫০০র-ও বেশি। ষড়দর্শনের বাকি পাঁচ দর্শনের মোট সূত্রের সংখ্যার চেয়েও মীমাংসা দর্শনে সূত্রের সংখ্যা বেশি, যা এর অতি বৃহদাকারকে নির্দেশ করে। বেদের কর্মকাণ্ডকে বুঝতে গেলে, বেদার্থ নির্ণয় করতে গেলে মীমাংসা দর্শনের পাঠ অপরিহার্য। বলা যেতে পারে যে মীমাংসা দর্শন সম্পর্কে জানলে কেউ বেদের কদর্থের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। জৈমিনির পরে শবরস্বামী, কুমারিলভট্ট এবং প্রভাকরের মতো আচার্যরা মীমাংসা দর্শনের ভাষ্য ও টীকা রচনা করেছেন। এটা নিরীশ্বরবাদী কিন্তু নাস্তিক দর্শন নয়। ভারতীয় দর্শন পরম্পরা অনুসারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকারকারী দর্শনগুলোকে আস্তিক ও অন্য দর্শনগুলোকে নাস্তিক বলা হয়।

পাশ্চাত্য গবেষকদের মতে মীমাংসার উৎপত্তি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর কাছাকাছি, যদিও এর শিকড় রয়েছে বেদেই। বেদের ব্রাহ্মণভাগে নানা আখ্যায়িকার দ্বারা কর্তব্যের মীমাংসা দেখানো হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈনমতের আক্রমণের বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুধর্মের বৈচারিক প্রতিরোধ মীমাংসা দর্শনে অভিব্যক্ত। যজ্ঞের পদ্ধতি, আত্মা, পশুবলি, স্বর্গ-নরকের অবধারণা সহ নানা বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে।

আচার্য শবরস্বামী মীমাংসা দর্শনের উপরে শাবরভাষ্য রচনা করেন। আজও মীমাংসা দর্শন বুঝতে হলে শাবরভাষ্যই সর্বপ্রধান অবলম্বন। এটা যুধিষ্ঠির সমাজীও তাঁর করা শাবরভাষ্যের অনুবাদে স্বীকার করেছেন। শাবরভাষ্যের উপরে কুমারিলভট্ট ও প্রভাকরমিশ্র তাঁদের টীকা রচনা করেন, এর মাধ্যমে মীমাংসা দর্শনে দুই সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। কুমারিলভট্টের মতকে ভাট্টমত ও প্রভাকরমিশ্রের মতকে গুরুমত বলা হয়। দুজনের মধ্যে নানাবিষয়ে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও মীমাংসা দর্শনের মূল অবধারণায় দুই পক্ষই একমত।

কুমারিলভট্ট শাবরভাষ্যের উপরে শ্লোকবার্তিক, তন্ত্রবার্তিক ও টুপ্টীকা নামে তিনটে ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন।

প্রভাকরমিশ্র শাবরভাষ্যের উপরে বৃহতী ও লঘ্বী নামে দুই টীকা লেখেন। এরপরে ভাট্টমত ও গুরুমতের অনুসারীরা নানা গ্রন্থ লিখে মীমাংসা দর্শনকে আরও সমৃদ্ধ করেন।
কুমারিলভট্টের অনুসারীদের ভাট্ট বলা হয়। এঁদের মধ্যে খণ্ডদেব মিশ্র, নারায়ণ ভট্ট, নারায়ণ পণ্ডিত, লৌগাক্ষি ভাস্কর, গাগা ভট্ট, শঙ্কর ভট্ট, কৃষ্ণযজ্ব আদি অনেক প্রসিদ্ধ আচার্য আছেন।
প্রভাকর মিশ্রের মতকে গুরুমত বলা হয়। শালিকনাথ মিশ্র, মহোদধি, ভবনাথ মিশ্র, নন্দীশ্বর, রামানুজাচার্য, অপ্পয় দীক্ষিত প্রমুখ গুরুমতের আচার্য ছিলেন।

মীমাংসা হল বিচারশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র। একে সম্যকরূপে জানতে হলে এর প্রকরণগ্রন্থ পড়তেই হবে। মীমাংসা দর্শনের প্রারম্ভিক শিক্ষার্থীদের জন্য আপদেবের মীমাংসান্যায়প্রকাশ, কৃষ্ণযজ্ব প্রণীত মীমাংসা পরিভাষা, লৌগাক্ষি ভাস্করের অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এরপরে মণ্ডনমিশ্রের বিধিবিবেক গ্রন্থও গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক কালে হিন্দী ভাষায় ড. মণ্ডনমিশ্রের লেখা বই, মীমাংসা দর্শনের ইতিহাস ও বাংলায় ড. বিশ্বরূপ সাহার লেখা মীমাংসা পরিচয় মীমাংসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসুদের জন্য অবশ্যপঠনীয় গ্রন্থ।
"চোদনালক্ষণোর্থো ধর্মঃ" (মীমাংসা ১।১।২) অর্থাৎ বেদ যা করতে আদেশ করেন, তাই হল ধর্ম। মীমাংসাশাস্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মের ব্যাখ্যা। বেদ হল ধর্মের বিষয়ে অন্তিম বা চূড়ান্ত প্রমাণ। কোনো পুরুষ বা এমনকি ঈশ্বরের দ্বারাও বেদ নির্মিত নয়, তাই বেদ অপৌরুষেয়। যোগদর্শনে ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলা হয়েছে। মীমাংসা দর্শন অনুসারে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সমষ্টিকে বেদ বলা হয়। অন্যান্য দর্শনেও এই একই কথা বলা হয়েছে। বেদের পাঁচটি ভাগ, মন্ত্র, বিধি, নিষেধ, অর্থবাদ ও নামধেয়। বেদের মন্ত্র বিধি নয়, তা মীমাংসা দর্শনে স্পষ্ট করা আছে (মীমাংসা দর্শন ২।১।৩০-৩১)। বেদের বিধি ও নিষেধ অনুসারে কর্তব্য নিরূপিত হয়। অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপককে বিধি বলা হয়। বিধি অর্থাৎ যা করতে বলা হয়েছে আর নিষেধ অর্থাৎ যা করতে বারণ করা হয়েছে। লোট্ লকার, লিঙ্ লকার ও তব্য, অনীয় প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয় বিধিকে নির্দেশ করে। বিধি সাক্ষাৎভাবে ধর্মের নির্ধারক, বাকিরা সহায়কমাত্র। মন্ত্র যজ্ঞে ব্যবহৃত দ্রব্য, যজ্ঞের দেবতা ইত্যাদির স্মারক; কিন্তু কর্তব্যকর্মের বিধায়ক নয়।
কুমারিলভট্টের মতে পদার্থ দুই প্রকার, প্রমাণ ও প্রমেয়। ভাট্টসম্প্রদায়ে ছয় প্রমাণ স্বীকার করা হয়, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। তেমনই প্রমেয় পাঁচ প্রকার; দ্রব্য, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও অভাব।



প্রভাকরসম্প্রদায়ে প্রমাণ পাঁচ প্রকার; প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি। অনুরূপভাবে প্রমেয় আট প্রকার; দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য।

প্রমাণ	বর্ণনা	উদাহরণ
প্রত্যক্ষ	প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধি	আগুন দেখা বা কোনো শব্দ শোনা
অনুমান	পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমান	দূরে পর্বতে ধোঁয়া দেখে আগুনের অনুমান
শব্দ	নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য (বৈদিক)	শব্দ অর্থাৎ বেদ
উপমান	সাদৃশ্য দ্বারা জ্ঞান	গরুর বর্ণনা থেকে গবয় সনাক্তকরণ
অর্থাপত্তি	পরিস্থিতি থেকে ধারণা	যে ব্যক্তি দিনে খায় না, কিন্তু মোটা হচ্ছে, সে ব্যক্তি রাতে অবশ্যই খায়

| অনুপলব্ধি (শুধু ভাট্ট) | অনুপস্থিতি থেকে জ্ঞান | ঘরে কোনও পাত্র না থাকা মানে এটি অনুপস্থিত

এই সারণীতে মীমাংসা দর্শনে গৃহীত প্রমাণগুলির সারসংক্ষেপ করা হয়েছে।

মীমাংসা দর্শন অনুসারে আত্মার অস্তিত্ব আছে, তা বিনষ্ট হয় না, এটা শরীর ও ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন (মীমাংসা দর্শন ১।১।৫, শাবরভাষ্য)। কুমারিলভট্টের মতে যাঁরা আত্মার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বুঝেছেন, কালক্রমে তাঁদের সঞ্চিত পূর্বকর্মের ফলভোগ শেষ হয়ে যায় আর কোনো কর্ম বাকি থাকে না, তাই পরে আর শরীরলাভ ঘটে না। কারণ পূর্বকর্মের ফলভোগের জন্যই আত্মা শরীরের সঙ্গে জুড়ে থাকে। তাই মোক্ষকামী ব্যক্তি বেদ অনুসারে নিষিদ্ধ কর্ম করবেন না, তিনি কোনো কাম্য কর্মও করবেন না, কারণ তাতেও পরবর্তীতে ফল ভোগ করতে হবে। তিনি শুধুই নিত্যকর্ম করবেন, কারণ নিত্যকর্ম না করলে পাপ হবে, ও তার ফল ভোগ করতে হবে (শ্লোকবার্তিক)। মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত নন; শবরস্বামী, কুমারিল ও প্রভাকর তিনজনেই ঈশ্বর নামক স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব মানেননি। বেদ অপৌরুষেয়, কেউই তার রচয়িতা নন। মীমাংসকরা জগতের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। তাঁরা দ্বৈতবাদী। অদ্বৈতদর্শনেও দ্বৈতবাদ ব্যবহারিক রূপে স্বীকৃত, তাই বলা হয়ে থাকে, ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ, অর্থাৎ কুমারিলভট্টের মতন আচরণ করবে।

মীমাংসা দর্শন অন্য পাঁচটি বৈদিক দর্শনের পরিপূরক। বেদান্ত ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষ খোঁজে, মীমাংসা জ্ঞানকাণ্ডের চেয়ে কর্মকাণ্ডের উপর মনোনিবেশ করে। উভয়ই বৈদিক কর্তৃত্বকে নিশ্চিত করে, কিন্তু বেদান্ত আচার-অনুষ্ঠানকে প্রস্তুতিমূলক হিসেবে দেখে, অন্যদিকে মীমাংসা সেগুলিকে পর্যাপ্ত রূপে দেখে। বাংলায় অন্য দর্শনের চেয়ে মীমাংসার চর্চা কমই হয়েছে, আজকের দিনেও অন্য দর্শনের প্রারম্ভিক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় সহজ উপলব্ধ ও বহুজনের দ্বারা আদৃত হলেও মীমাংসার প্রতি আগ্রহ কম। তবে বেদকে শুরু থেকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে মীমাংসা দর্শনকেও পড়া ছাড়া কোনো অন্য পথ নেই, সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসুদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে আমার এই অতিক্ষুদ্র প্রয়াস কিঞ্চিন্মাত্রও সফল হলে ভাল লাগবে। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয় মীমাংসা দর্শনের নানা উৎস হতে সংগৃহীত হয়েছে। এর জন্য কৃতিত্ব সেই আচার্যদের আর এতে কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে তা একান্তই আমার। এই বলে সবাইকে মীমাংসাদর্শন পড়তে অনুরোধ করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি। শ্রীদুর্গার্পণমস্তু।

গ্রন্থপঞ্জী -
১) মীমাংসা শাবরভাষ্য, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা অনূদিত
২) মীমাংসা শাবরভাষ্য, ভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনূদিত
৩) শ্লোকবার্তিক, কুমারিলভট্ট
৪) মীমাংসা পরিচয়, ড. বিশ্বরূপ সাহা
৫) মীমাংসা ন্যায়প্রকাশ, আপদেব, ড. বিশ্বরূপ সাহা অনূদিত
৬) মীমাংসা পরিভাষা, কৃষ্ণযজ্ব, স্বামী বাসুদেবানন্দ অনূদিত
৭) Purva Mimamsa in Its Sources, MM Ganganath Jha



শ্রীবিষ্ণুভাগবত পুরাণোক্ত বামন অবতারের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত

অর্ক বিশ্বাস
গবেষক, সনাতন শাস্ত্র গবেষণা কমিটি

আলোচ্য ঘটনাবলি: রাজা বলির স্বর্গ বিজয়, মহর্ষি কশ্যপ কর্তৃক অদিতিকে পয়োব্রতের উপদেশ, ভগবানের আবির্ভাব এবং অদিতিকে বরদান, বলির যজ্ঞে শ্রীভগবানের বামন রূপে আবির্ভাব, ভগবান বামন কর্তৃক বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি-প্রার্থনা, বলির প্রতিজ্ঞা ও শুক্রচার্যের বাধা দান, বামন অবতারের বিরাট রূপ ধারণ এবং পৃথিবী ও স্বর্গকে ব্যাপ্ত করে দুই পদক্ষেপ গ্রহণ, বিষ্ণু কর্তৃক বলি বন্ধন, বলি কর্তৃক ভগবানের স্তুতি ও বলির প্রতি ভগবানের প্রসন্নতা, বলির বন্ধন মুক্তি ও সুতললোকে গমন।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে বামন অবতার এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছেন। ক্ষুদ্র বামন রূপে তিনি প্রকাশ পেলেও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে অসীম শক্তি ও গভীর শিক্ষা। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিকে বামন জয়ন্তী বলা হয় — এই শুভ দিনে মহর্ষি কশ্যপ ও দেবী অদিতির গৃহে আবির্ভূত হন শ্রীবামন। শ্রীবিষ্ণুভাগবত পুরাণে শুকদেব গোস্বামী মহারাজ মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট এই অবতারের কাহিনী বিশদে বর্ণনা করেছেন। অসুররাজ বলি দানের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করলেও, তার অন্তরে অহংকারের বীজ জন্ম নিয়েছিল। ভগবান বামন সেই অহংকারকেই বিনয়ের দ্বারা বিনষ্ট করলেন—দুই পা ভূমি ও আকাশ জুড়ে নিলেন, তৃতীয় পা স্থা এই পিত হলো বলির মস্তকে। এখানেই প্রকাশ পেলো চিরন্তন সত্য—অহংকার পতনের মূল। যে সামান্যরূপে প্রকাশিত ভগবানকে চিনতে ব্যর্থ হয়, তার ঐশ্বর্য টেকে না। তাই বামন অবতারের আখ্যান কেবল পুরাণগাথা নয়, মানবজীবনের পথপ্রদর্শক শিক্ষা। সেই আখ্যানকেই বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান! শ্রীহরি

তো সর্বেশ্বর, তবু তিনি কেন দীনের মতো বলির নিকট তিন পদ ভূমির প্রার্থনা করেছিলেন? প্রার্থিত বিষয় পাওয়ার পরেও কেন তিনি বলিকে আবদ্ধ

করেছিলেন? পরিপূর্ণ যজ্ঞেশ্বরের প্রার্থনা করা এবং নিরপরাধের বন্ধন- এই দুই ব্যাপারই আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। এই উভয় কার্যই কী করে সম্ভব হল তা জানতে ইচ্ছা করছে। শ্রীশুকদেব বললেন—হে

রাজন! যখন ইন্দ্র বলিকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর সম্পত্তি অপহরণ করেন এবং তাঁর প্রাণ নাশ করেন তখন ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য বলিকে সঞ্জীবনী বিদ্যার সাহায্যে জীবিত করলেন। এই ঘটনার পর শুক্রাচার্যের শিষ্য বলি সমস্ত ধনসম্পত্তি তাঁর চরণে দান করে কায়মনোবাক্যে গুরুর এবং ভৃগুবংশের সমস্ত ব্রাহ্মণদের সেবা করতে লাগলেন। সেইজন্য ভৃগুবংশের মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলির স্বর্গ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা হেতু তাঁর মহাভিষেক করিয়ে তাঁকে দিয়ে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করালেন।

যজ্ঞের বিধি অনুসারে যখন ঘৃত দ্বারা অগ্নিদেবের পূজা করা হল তখন যজ্ঞকুণ্ড থেকে স্বর্ণপটে মোড়া এক রথ আবির্ভূত হল। ইন্দ্রের ঘোড়ার মতো সবুজ রঙের কয়েকটি ঘোড়া ও সিংহচিহ্নিত ধ্বজা রথে লাগাবার জন্যে প্রকট হল। সেই সঙ্গে সোনার ধনু ও অক্ষয় বাণপূর্ণ দুটি তূণ এবং দিব্য কবচ আবির্ভূত হল। পিতামহ প্রহ্লাদ তাঁকে দিলেন অম্লান পুষ্প দিয়ে গাঁথা মালা এবং শুক্রাচার্য দিলেন শঙ্খ। এইরূপে ব্রাহ্মণদের কৃপায় যুদ্ধের সমস্ত সামগ্রী লাভ করে এবং ব্রাহ্মণরা স্বস্ত্যয়ন করলে বলি ব্রাহ্মণদের প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করলেন। তারপর তিনি পিতামহ প্রহ্লাদকে সম্ভাষণ করে প্রণাম করলেন। তারপর ভৃগুবংশের ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রদত্ত রথে আরোহণ করে যখন মহারথী বলি কবচ, ধনুক, তলোয়ার, তূণ প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করে প্রহ্লাদের দেওয়া মালা পরলেন, তখন তাঁর শোভা অত্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল। তাঁর বাহুতে সোনার অঙ্গদ ও কর্ণে মকরকুণ্ডল ঝকঝক করছিল, এই সমস্ত ধারণ করে তিনি যখন রথে বসেছিলেন তখন তাঁকে যেন অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্বলিত
অগ্নি বলে মনে হচ্ছিল। মহারাজ বলির মতোই
ঐশ্বর্যবান শক্তিশালী শ্রীসম্পন্ন দৈত্য সেনাপতিরা নিজ নিজ সেনাদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। মনে হচ্ছিল যে দৈত্য সেনাপতিরা দৃষ্টিদ্বারা আকাশকে পান করে ফেলবেন এবং পৃথিবী ও দিক্‌কলকে ভস্ম করে দেবেন। রাজা বলি এইরূপ বিশাল আসুরী সেনা নিয়ে স্বর্গ ও মর্ত্য কাঁপিয়ে ঐশ্বর্যপূর্ণ ইন্দ্রপুরীকে আক্রমণ করলেন এবং নিপুণভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন।

দেবতাদের রাজধানী অমরাবতীতে সুন্দর সুন্দর নন্দন-বন এবং নানারকম উদ্যান আর উপবন আছে। সেই উদ্যানে আর উপবনে বিহঙ্গমিথুনেরা কূজন করছে। মধুর লোভে ভ্রমরেরা মত্ত হয়ে গুঞ্জন করছে। প্রবালসদৃশ রক্তিম নবীন পত্র, ফল এবং পুষ্পভাবে দেবতরুগুলির শাখাসমূহ অবনত। সরোবরে হংস, সারস, চক্রবাক ও বকেরা ভীড় করে থাকে এবং দেবভোগ্য দেবাঙ্গনারা জলক্রীড়া করেন। জ্যোতির্ময় আকাশ গঙ্গা অমরাবতীর চতুর্দিকে পরিখার মতো বেষ্টন করে আছে। তার চতুর্দিকে উচ্চ অগ্নিবর্ণ সোনার প্রাচীর ও মধ্যে মধ্যে উপরিভাগে যুদ্ধ-ক্ষেত্র তৈরি রয়েছে।গৃহদ্বারের কপাটগুলি স্বর্ণনির্মিত আর পুরদ্বারগুলি স্ফটিক নির্মিত। পৃথক পৃথক রাজপথযুক্ত এই অমরাবতী পুরী স্বয়ং বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছেন। (সেই ইন্দ্রপুরী) সভাস্থল, ক্রীড়াঙ্গন এবং রথচালনোপযোগী প্রশস্ত রাজপথদ্বারা সুশোভিত। দশ কোটি বিমান সেখানে সর্বদা উপস্থিত এবং মণিমাণিক্যে তৈরি চৌরাস্তাগুলি হীরে ও প্রবালের তৈরি বেদীদ্বারা সুশোভিত। স্থিরযৌবনা নির্মলবসনা সুন্দরী ষোড়শীদের রূপের ছটায় সেই স্থান (অমরাবতী) প্রভাসমন্বিত বহ্নির ন্যায় সুশোভিত। দেবাঙ্গনাদের কবরী থেকে খসে পড়া ফুলের সুবাসে সুগন্ধিত বায়ু রাজপথে মৃদু মৃদু গন্ধ বহন করে প্রবাহিত। স্বর্ণময় গবাক্ষ থেকে পাণ্ডুর বর্ণ, অগুরুগন্ধযুক্ত ধূমজাল নির্গত হয়ে পথকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সুর সুন্দরীরা সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন।

(সেই ইন্দ্রপুরীতে) স্থানে স্থানে মুক্তার ঝালর দেওয়া চাঁদোয়া লাগানো আছে, স্বর্ণময় ধবজাসকল বায়ু দ্বারা আন্দোলিত হচ্ছে, ছাদের উপর নানারকম পতাকা উড়ছে। ময়ূর, পারাবত ও ভ্রমর কলধবনি করছে। দেবাঙ্গনাদের সুমধুর গানে সেখানে সর্বদাই মঙ্গল বিরাজ করে। মৃদঙ্গ, শঙ্খ, আনক, দুন্দুভি, বীণা, ঢোল, বাঁশি, মঞ্জীরা এবং ঋষ্টি বাজতে থাকে। গন্ধর্বেরা বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গান করতে থাকেন এবং অপ্সরারা নৃত্য করতে থাকেন। এর দ্বারা অমরাবতীর সৌন্দর্য এত বৃদ্ধি পায় যে, তার প্রভায় সাক্ষাৎ দীপ্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রভাও ম্লান হয়ে যায়। যারা অধার্মিক, খল, ভূতদ্রোহী, শঠ, অহংকারী, কামুক ও লোভী- —তারা সেখানে যেতেই পারে না। যারা এই সব দোষ থেকে মুক্ত, কেবল তারাই সেখানে প্রবেশ করতে পারে।

দৈত্য সেনাপতি বলি নিজের বৃহৎ সৈন্যবাহিনী দিয়ে অমরাবতীকে চতুর্দিকে ঘিরে ফেললেন। ইন্দ্রের পত্নীদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে শুক্রাচার্য প্রদত্ত মহাশঙ্খ জোরে জোরে বাজাতে লাগলেন।

সেই শঙ্খধবনি সর্বত্র নিনাদিত হতে লাগল।

দেবরাজ ইন্দ্র দেখলেন বলি যুদ্ধের জন্যে বেশ ভালোভাবেই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। সুতরাং তিনি সব দেবতাদের

নিয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির নিকটে গিয়ে বললেন। "হে প্রভু ! আমার পূর্ব-শত্রু বলি এবার প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে এসেছে। আমার মনে হচ্ছে আমরা এবার তার সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠব না। বুঝতে পারছি না, কোন অমোঘ শক্তির বলে সে এত বলীয়ান হয়ে উঠল। বলিকে এবার কেউই কোনোভাবেই বাধা দিতে পারবে না। প্রলয়কালীন অগ্নির মতো বলি যেন মুখ দিয়ে বিশ্বকে পান করবে, জিহ্বা দিয়ে দশদিককে
লেহন করবে এবং চক্ষু দিয়ে দিঙ্-মণ্ডলকে ভস্ম করে দেবে। আপনি দয়া করে বলুন, এর এত শক্তি বৃদ্ধির কী কারণ! একে কোনোভাবেই আটকানো যাচ্ছে না। এর শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়াদিতে এত শক্তি, এত তেজ কোথা থেকে এল, যার জন্য সে এইভাবে তৈরি হয়ে আমাদের আক্রমণ করেছে?"
দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন— "ইন্দ্র! তোমার শত্রু বলির বলবৃদ্ধির কারণ আমি জানি। ব্রহ্মবাদী ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণরা তাঁদের শিষ্য বলিকে তেজঃ প্রদান করে তাকে শক্তিশালী করে তুলেছেন।। একমাত্র সর্বশক্তিমান ভগবান বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেউই তাকে জয় করতে পারবে না, যেমন কালের (মৃত্যুরাজ যমের) সম্মুখে কোনো প্রাণীই অবস্থান করতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তোমরা স্বর্গে না থেকে অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকো এবং যতদিন না তোমাদের শত্রুর ভাগ্য পরিবর্তন (পরাভব) হয় ততদিন অপেক্ষা করো। বর্তমানে ব্রাহ্মণের তেজে বলির ক্রমশ বলবৃদ্ধি হচ্ছে। যখন সে ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা করবে তখনই সে সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতাদের স্বার্থ এবং পরমার্থ এই উভয় বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞ। যখন তিনি দেবতাদের এইরূপ উপদেশ দিলেন, তখন দেবতারা নিজেদের ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করে ছদ্মবেশে স্বর্গ ছেড়ে চলে গেলেন। বিরোচন পুত্র বলি অমরাবতী অধিকার করে ত্রিভুবন জয় করে নিলেন।
যখন বলি বিশ্ববিজয়ী হলেন তখন ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণরা তাঁদের অনুগত শিষ্য বলিকে দিয়ে একশো অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করালেন। সেই যজ্ঞের প্রভাবে তাঁর কীর্তি দশদিকে বিস্তৃত হল আর তিনি নক্ষত্রের রাজা চন্দ্রের মতো বিরাজ করতে লাগলেন। এইরূপে বলি নিজেকে কৃতার্থ মনে করে ব্রাহ্মণদের প্রসাদে উপলব্ধ সম্পদ ও রাজ্যলক্ষ্মীকে ভোগ করতে লাগলেন।
শ্রীশুকদেব বললেন- হে মহারাজ ! যখন দেবতারা স্বর্গ থেকে পালিয়ে গেলেন এবং বলি ইন্দ্রপুরী অধিকার করে নিলেন, তখন দেবমাতা অদিতির খুব দুঃখ হল। তিনি অনাথের মতো বিলাপ করতে লাগলেন। অনেকদিন পর কশ্যপমুনির সমাধি ভঙ্গ হলে তিনি অদিতির আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং দেখলেন সেখানে সুখ-শান্তি নেই, কোনো কাজের উৎসাহ নেই, এমনকি আশ্রমকে ঠিকমতো সাজানোও হয়নি। হে কুরুকুলতিলক! তিনি সেখানে গিয়ে অদিতি কর্তৃক যথোচিত আপ্যায়িত হলেন এবং আসন গ্রহণ করলেন। পত্নী অদিতিকে ম্লানমুখী দেখে ন্যায়ানুসারে তিনি বলতে লাগলেন। "হে কল্যাণী! এখন ব্রাহ্মণদের কোনোরকম বিপদ হয়েছে কি? ধর্মের পালন ঠিক মতো হচ্ছে তো ? মৃত্যুর বশবর্তী জীবদের কোনো অমঙ্গল হয়নি। তো? হে সতী! গৃহস্থাশ্রমে যারা যোগী নয় তাদেরও যোগের ফল লাভ হয়। এই গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিন বর্গের সাধনে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি তো? এমনও হতে পারে যে, তুমি আত্মীয়স্বজনদের পালন করার জন্যে গৃহকাজে ব্যস্ত ছিলে এবং অতিথি বিনা সৎকারেই ফিরে গেছেন। তুমি কি সেই কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়েছ? যে গৃহ থেকে অতিথি অন্তত জলদ্বারাও অভ্যর্থিত না হয়ে ফিরে চলে যান, সেই গৃহ শৃগাল গৃহতুল্য। হে সতী! হে কল্যাণী! এমন কী হয়েছে যে, আমি প্রবাসে চলে যাওয়ায় তোমার মন উদ্বিগ্ন হয়েছিল এবং সেইজন্যে তুমি যথাকালে অগ্নিতে হোম করতে ভুলে গেছ? সর্ব দেবময় ভগবানের মুখ হচ্ছেন অগ্নি ও ব্রাহ্মণ। গৃহস্থ যদি এই দুয়ের পূজা করে তবে তারা সর্বকামনাপূরণকারী লোক প্রাপ্ত হয়। হে মনস্বিনী ! তুমি তো সবসময়ই প্রসন্ন থাকো, কিন্তু কিছু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে তুমি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছ। তোমার সন্তানদের সব কুশল তো?”
অদিতিদেবী বললেন – "হে ভগবান! ব্রাহ্মণ, গো, ধর্ম এবং আপনার এই দাসী কুশলেই আছে। হে স্বামিন্ ! এই গৃহস্থ আশ্রম ধর্ম, অর্থ ও কামের সহায়ক। হে প্রভু ! আমি নিরন্তর আপনার ধ্যান করি বলে অগ্নি, অতিথি, সেবক, ভিক্ষুক এবং অন্যান্য প্রার্থীরা নিরন্তর সংস্কৃত হয়ে থাকেন, কেউই তিরস্কৃত হন না। আপনার মতো প্রজাপতি যখন আমায় এমন করে ধর্মোপদেশ দান করেন তখন হে ভগবান ! আমার কোনো কামনা কি কখনো অপূর্ণ থাকতে পারে? হে আর্যপুত্র! সত্ত্বগুণী, রজোগুণী বা তমোগুণী সকল প্রজাই আপনারই সন্তান। কিছু আপনার সংকল্প থেকে এবং অনেকে আপনার শরীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। ভগবান ! অসুর কিংবা দেবতা সব সন্তানের প্রতিই আপনার সমভাব (সকলকে আপনি সমানভাবে দেখেন) তথাপি স্বয়ং পরমেশ্বর ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন। হে দেব ! আমি আপনার সেবিকা। আপনি আমার মঙ্গলের কথা চিন্তা করুন। হে মর্যাদাপালক প্রভু ! শত্রুরা আমাদের

(আমার এবং পুত্র দেবতাদের) সম্পত্তি ও বাসস্থান অপহরণ করেছে। আপনি আমাদের রক্ষা করুন। শক্তিশালী অসুররা (দেবমাতা যে আমি, সেই) আমার ঐশ্বর্য, ধনসম্পত্তি, যশ এবং স্থান অধিকার করে সপুত্র আমাকে গৃহহীন করেছে। তাই আমি দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়ে আছি । হে সাধু ! হে মঙ্গলকৃত্তম! (শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী)! আপনা অপেক্ষা অধিক কেউ আমার মঙ্গল কামনা করবে না। সুতরাং হে মঙ্গলকারী ভগবান! আপনি সংকল্প করুন যাতে আমার পুত্রেরা তাদের সব সম্পত্তি আবার ফিরে পায়।"

শ্রীশুকদেব বললেন—এইভাবে অদিতি কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে মহর্ষি কশ্যপ বিস্ময় ও স্মিতহাস্যে বললেন, "অতীব আশ্চর্যের বিষয়, ভগবানের মায়ার কী প্রবল শক্তি ! সমস্ত বিশ্ব স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। কোথায় পঞ্চভূতে তৈরি এই নশ্বর দেহ আর কোথায়ই বা প্রকৃতির অতীত অবিনাশী আত্মা! কেউ কারোর স্বামী নয়, কেউ কারোর পুত্র নয়, আবার কেউ কারোর আত্মীয়স্বজন নয়, একমাত্র মায়ার বন্ধনেই সকল জীব আবদ্ধ। হে ভামিনী! যিনি সর্বভূতের হৃদয়ে বাস করেন, নিজের ভক্তদের দুঃখ নিবারণ করেন সেই বাসুদেবের আরাধনা করো! তিনি দীনদয়াল। তিনি অবশ্যই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবানের সেবা কখনো ব্যর্থ হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই।"

অদিতি জিজ্ঞাসা করলেন—"ভগবান! আমি জগদীশ্বরের আরাধনা কী বিধিতে করব, যাতে সেই সত্য সংকল্প প্রভু সন্তুষ্ট হয়ে আমার মনোরথ পূর্ণ করবেন? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ!
পুত্রদের সঙ্গে আমি ক্লেশ ভোগ করছি। তিনি যাতে শীঘ্রই প্রসন্ন হন সেইরূপ আরাধনার উপায় আমাকে বলুন। " মহর্ষি কশ্যপ বললেন—"দেবী! যখন আমার সন্তান লাভের ইচ্ছা হয়েছিল তখন আমি ভগবান ব্রহ্মাকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বিষ্ণুকে প্রসন্ন করার উপায়স্বরূপ যে ব্রতের উপদেশ আমায় দিয়েছিলেন আমি সেই উপদেশই তোমায় দিচ্ছি। ফাল্গুন মাসের শুরু পক্ষে বারো দিন (শুক্লা প্রতিপদ তিথি থেকে দ্বাদশী তিথি পর্যন্ত) শুধুমাত্র দুধ পান করে পরম ভক্তিভরে কমলনয়ন ভগবান বিষ্ণুর পূজা করতে হবে। যদি পাওয়া যায় তবে অমাবস্যা তিথিতে বন্যবরাহ বিদারিত মৃত্তিকা নিজ শরীরে লেপন করে নদীতে স্নান করে এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। (অবগাহন মন্ত্র) হে দেবী (ভূমিদেবী) ! আদি বরাহ ভগবান প্রাণীদের বাসস্থানের জন্যে রসাতল থেকে আপনাকে উদ্ধার করেছেন আপনাকে নমস্কার। আপনি আমার পাপ বিনাশ করুন। অতঃপর নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমাপনান্তে একাগ্র চিত্তে মূর্তি, ভূমি, সূর্য, জল, অগ্নি এবং গুরুদেবের মধ্যে ভগবানের ভাবনা করে
পূজা করবে। (এবং এইভাবে স্তুতি করবে) — "হে প্রভু! আপনি সর্বশক্তিমান, অন্তর্যামী এবং আরাধ্য। আপনি সকল প্রাণীর আশ্রয় স্থান এবং সকল প্রাণীর অন্তরে বাস করেন। সেইজন্যে আপনাকে 'বাসুদেব' বলা হয়। আপনি বিশ্বচরাচর এবং তার কারণের সাক্ষী। আপনাকে প্রণাম।আপনি অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম এবং পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে অবস্থান করেন। চতুর্বিংশতিগুণজ্ঞ এবং সাংখ্য শাস্ত্রের প্রবর্তক আপনাকে নমস্কার। আপনি সেই যজ্ঞস্বরূপ যার প্রায়নীয় ও উদয়নীয় নামে যাগদ্বয় দুটি মস্তক। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল—এই তিন সময় আপনার তিন পদ, চার বেদ চারটি শৃঙ্গ। গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দ আপনার সাতটি হস্ত। এই ধর্মময় বৃষভরূপ যজ্ঞ বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত এবং এর আত্মাও আপনি স্বয়ং। আপনাকে আমার প্রণাম। আপনি জীবের কল্যাণকারী শিব আবার প্রলয়কারী রুদ্র। সমস্ত শক্তিকে ধারণকারীও আপনিই। আপনাকে বারবার নমস্কার। আপনি সর্ববিদ্যার অধিপতি ও ভূতসমূহের প্রভু! আপনাকে প্রণাম। আপনি সকলের প্রাণ এবং এই জগতের স্বরূপ। আপনি যোগের কারণ এবং স্বয়ং যোগ। এর থেকে যে ঐশ্বর্য লাভ করা যায় তাও আপনিই। হে হিরণ্যগর্ভ
আপনাকে নমস্কার। আপনি আদিদেব, সাক্ষীভূত।আপনি নর-নারায়ণ ঋষির রূপে প্রকট হয়েছেন এবং সর্বদুঃখাপহারক শ্রীহরি। আপনাকে নমস্কার।
আপনার শরীর মরকত মণির ন্যায় শ্যামবর্ণ। সকলধনসম্পত্তি ও সৌন্দর্যের দেবী লক্ষ্মী আপনার সেবিকা। হে পীতাম্বর ! আপনাকে বারবার নমস্কার।আপনি বরদ শ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রকার বরদাতা। তাই জীবের একমাত্র বরণীয়। সেইজন্য ধীর ব্যক্তিরা নিজেদের মঙ্গলার্থে আপনার পদরজের আরাধনা করে থাকে। যাঁর পাদপদ্মের সৌরভ লাভ করার জন্য সকল দেবতা এমন কী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত সেবা করে থাকেন সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। হে প্রিয়ে ! ভগবান হৃষীকেশকে প্রথমেই আবাহন করবে। তারপর এই মন্ত্রদ্বারা পাদ্য-আচমণ প্রভৃতি দিয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক মনোযোগ সহকারে তাঁর পূজা করবে। গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি দ্বারা ভগবানকে পূজা করে দুধ দিয়ে স্নান

করাবে। তারপর বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, আভরণ, পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ ও ধূপ প্রভৃতি দ্বারা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র পাঠ করে (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র) ভগবানের পূজা করবে। যদি ব্যয় সামর্থ্য থাকে তবে দুগ্ধপক্ক শাল্যন্ন দ্বারা প্রস্তুত ঘৃত ও গুড় মিশ্রিত পায়সান্ন নিবেদন করবে এবং তারপর দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র দিয়ে হোম করবে। সেই প্রসাদ নৈবেদ্য ভগবদ্‌ভক্তদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে অথবা নিজে গ্রহণ করবে। পরে পূজান্তে আচমন ও তাম্বুল নিবেদন করবে।অষ্টোত্তরশতসংখ্যক বার (একশো আট বার) দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপ করবে এবং অন্যান্য স্তব পাঠ করে ভগবানের স্তুতি করবে। তারপর প্রদক্ষিণ করে সানন্দে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে। দেবতার নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করে দেবতাকে বিসর্জন দেবে। অন্তত পক্ষে দুজন ব্রাহ্মণকে পায়সান্ন ভোজন করাবে। দক্ষিণা দিয়ে তাঁদের (ব্রাহ্মণদের) সৎকার করবে। অতঃপর তাঁদের অনুমতি নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে অবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করবে। সেই দিন ও রাত্রিতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করবে। পরের দিন প্রাতঃকালে স্নান করে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ভগবানের পূজা করবে। এইভাবে যতদিন না ব্রত শেষ হয় ততদিন দুধ দিয়ে ভগবানকে স্নান করিয়ে পূজা করবে। এইভাবে সানন্দে দুগ্ধাহারী হয়ে বিষ্ণুপূজাপরায়ণ হতে হবে। প্রতিদিন পূর্ববৎ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে। এইভাবে বারোদিন দুগ্ধাহারী থেকে প্রতিদিন হোম, ভগবানের আরাধনা ও পূজা করবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। ফাল্গুন মাসের শুরু পক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করবে, ভূমিতে শয়ন করবে ও তিনবার করে স্নান করবে। মিথ্যা কথা বলবে না। পাপীর সঙ্গে আলাপ করবে না। পাপ বিষয়ে আলোচনা করবে না। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সব রকম ভোগই ত্যাগ করবে। কোনো প্রাণীর প্রতি হিংসা করবে না। কেবল ভগবানের আরাধনায় একাগ্র হয়ে থাকবে। ত্রয়োদশীর দিন শাস্ত্রবিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা ভগবানকে পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করাবে। কৃপণতা বর্জন করে যথাসাধ্য ধন ব্যয়ে ভগবানের মহতী পূজার আয়োজন করতে হবে এবং দুধে চরু (পরমান্ন বা পায়স) রান্না করে ভগবানকে নিবেদন করবে। দুধে চরুপাক করে সুসমাহিত চিত্তে
ভগবানের যজনা করবে এবং তিনি যে সমস্ত বস্তু গ্রহণ করে প্রসন্ন হন সেই সমস্ত দ্রব্য নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করবে। তারপর জ্ঞানী আচার্য ও যাজ্ঞিকদের বস্ত্র, অলংকার এবং গরু দান করে সন্তুষ্ট করবে। হে প্রিয়ে ! একেই ভগবানের আরাধনা বলে মনে করবে। হে শুচিস্মিতে! আচার্য ও ঋত্বিক ব্রাহ্মণদের শুদ্ধ, পবিত্র ও নানা গুণবিশিষ্ট অন্ন ভোজন করাবে; সেইসঙ্গে অন্য ব্রাহ্মণদের এবং অন্যান্য অতিথিদেরও সামর্থ্য অনুযায়ী ভোজন করানো উচিত। গুরু ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের যথাসাধ্য ও যথাযোগ্য দক্ষিণা দেবে। স্বেচ্ছায় আগত চণ্ডাল এবং অন্ধ, দীনদুঃখী ও অসমর্থ লোকেদের অন্ন বিতরণ করে সন্তুষ্ট করবে। দীন-দরিদ্র-অন্ধের সেবা ভগবৎ-সন্তুষ্টির জন্যই করা হয়েছে মনে করে ভাই-বন্ধুদের সঙ্গে নিজে ভোজন করবে। প্রতিপদ থেকে ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত প্রতিদিন নৃত্য-গীত-বাদ্য-স্তুতি স্বস্তিবাচন এবং হরিকথা শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা প্রতিদিন ভগবানের পূজা করবে। এই হল ভগবানের শ্রেষ্ঠ আরাধনা। এর নাম 'পয়োব্রত'। পিতামহ ব্রহ্মা আমায় যেমন বলেছিলেন আমি
তোমাকে ঠিক সেইভাবে বললাম। দেবী, তুমি ভাগ্যবতী। ইন্দ্রিয়দের নিজের বশীভূত করে শুদ্ধ মনে শ্রদ্ধা সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে অবিনাশী ভগবানের আরাধনা করো। হে কল্যাণী! এই ব্রত ভগবানকে সন্তুষ্ট করে, সেইজন্যে এর নাম 'সর্বযজ্ঞ' ও 'সর্বব্রত'। এই ব্রত সকল তপস্যার সার এবং এই দানে ভগবান তৃপ্ত হন। যাতে ভগবান প্রসন্ন হন সেটিই আসল নিয়ম, শ্রেষ্ঠ যম (সংযম), শ্রেষ্ঠ তপস্যা, দান, ব্রত এবং যজ্ঞ। অতএব, হে দেবী! তুমি সংযম ও শ্রদ্ধা সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করো। ভগবান শীঘ্রই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তোমার মনোরথ পূর্ণ করবেন।"

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! অদিতি স্বীয় পতি মহর্ষি কশ্যপের উপদেশ অনুসারে বারো দিন ব্যাপী অতীব সংযত চিত্তে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। বুদ্ধিকে সারথি করে মনের লাগাম দিয়ে চঞ্চল অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করলেন এবং একাগ্র চিত্তে তিনি পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্তা করতে লাগলেন। একাগ্র বুদ্ধির সাহায্যে নিজের মনকে ভগবান বাসুদেবে সম্পূর্ণ সমাহিত করে পয়োব্রত অনুষ্ঠান পালন করলেন। হে বৎস! তখন তাঁর (অদিতির) সম্মুখে পীতাম্বর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ আদি পুরুষ ভগবান আবির্ভূত হলেন। চোখের সামনে হঠাৎ ভগবানকে আবির্ভূত হতে দেখে অদিতি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আনন্দে বিহ্বল হয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভগবানের স্তুতি করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আনন্দাশ্রু তাঁর কণ্ঠকে রুদ্ধ করল, তিনি কথা বলতে পারলেন না। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হতে লাগল, স্তব্ধ হয়ে তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। হে কুরুকুলতিলক ! দেবী অদিতি প্রেমপূর্ণ নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্মীপতি, বিশ্বপতি যজ্ঞেশ্বর ভগবানকে এমনভাবে দর্শন করতে লাগলেন যেন চক্ষু দ্বারা তিনি ভগবানকে পান করে ফেলবেন। তারপর প্রেমে গদগদ হয়ে

ধীরে ধীরে তিনি ভগবানের স্তুতি করলেন।
দেবী অদিতি বললেন—"আপনি যজ্ঞের প্রভু এবং নিজেই স্বয়ং যজ্ঞ। হে অচ্যুত! আপনার চরণকমলের আশ্রয় নিয়ে লোকে ভবসাগর পার হয়ে যায়। আপনার যশঃকীর্তন শ্রবণ করলে সংসার থেকে মুক্তি লাভ হয়। আপনার নাম শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল হয়। হে আদিদেব! যে আপনার শরণাপন্ন হয় তার সমস্ত বিপদ আপনি হরণ করেন। হে ভগবান! আপনি দরিদ্রের প্রভু। আপনি আমাদের মঙ্গল করুন। আপনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ এবং আপনিই বিশ্বরূপ। আপনি অনন্ত হয়েও স্বেচ্ছায় অনেক শক্তি ও মায়াগুণকে স্বীকার করেন। আপনি সর্বদা নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন অর্থাৎ নির্বিকার স্বরূপ। আপনি নিত্য উজ্জ্বল পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে আত্মার বিমোহিত অন্ধকারকে দূর করেন। হে ভগবান! আপনাকে প্রণাম। হে অনন্ত প্রভু! আপনি প্রসন্ন হলে মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করে ব্রহ্মার মতো দিব্য শরীর, অনুপম ঐশ্বর্য, অভীষ্ট বস্তু, স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল, অণিমাদি যোগশক্তি সমুদায়, ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করে থাকে। অতএব শত্রুকে পরাজয় করার ক্ষমতা সে লাভ করবে এতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই।"
শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন! অদিতি এইভাবে পদ্মপলাশলোচন শ্রীভগবানের স্তুতি করলে সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করে তাদের গতিবিধির সাক্ষীস্বরূপ ভগবান বললেন। শ্রীভগবান বললেন—"হে দেব জননী অদিতি! তোমার চিরপোষিত অভিলাষ আমি জানি। শত্রুরা তোমার পুত্রদের সম্পত্তি অপহরণ করে তাদের রাজ্যচ্যুত করেছে। তোমার পুত্রেরা যুদ্ধে দুর্মদ অসুরদের পরাজিত করে যাতে রাজলক্ষ্মী ফিরে পায় এবং তুমি তাঁদের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করো, এই তোমার কামনা। তোমার ইন্দ্রাদি পুত্রেরা শত্রুদের বধ করলে তাদের (অসুরদের) স্ত্রীরা মৃত স্বামীর জন্যে হাহাকার করবে, তুমি সেই দৃশ্যও দেখতে ইচ্ছা রাখ। হে অদিতি! তোমার অভিলাষ যে, তোমার পুত্রদের ধন-সম্পত্তি ও শক্তি বৃদ্ধি হোক এবং তারা যশঃ ও ঐশ্বর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করে সেখানে পূর্বের মতো প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু দেবী! সেই অসুররাজ বলিকে এখন পরাজিত করা সম্ভব নয়, এই আমার ধারণা। কারণ দৈব এবং ব্রাহ্মণগণ এখন অনুকূল হয়ে তাঁকে রক্ষা করছেন। এইসময় তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলে কোনো সুখদায়ক ফল লাভের আশা নেই। তথাপি, হে দেবী! তোমার এই ব্রত অনুষ্ঠানের জন্য আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, অতএব এই ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উপায় স্থির করব। কারণ, আমার আরাধনা ব্যর্থ হতে পারে না। শ্রদ্ধানুরূপ ফল নিশ্চয়ই তুমি লাভ করবে। তুমি নিজের পুত্রদের রক্ষার জন্য পয়োব্রত অনুষ্ঠান নিয়ম পালন করে আমার পূজা এবং স্তুতিও করেছ। সুতরাং আমি অংশ হয়ে কশ্যপের বীর্যে প্রবেশ করে এবং তোমার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে তোমার পুত্রদের রক্ষা করব। হে কল্যাণী ! তুমি তোমার পতি কশ্যপের মধ্যে আমাকে দর্শন করো এবং সেই নিষ্পাপ প্রজাপতির সেবা করো। দেবী! এই সকল দেবরহস্য কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলেও কাউকে বলবে না। কারণ, দেবগুহ্য কথা যত গোপন থাকে তত বেশি ফলদায়ক হয়।"
শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন! এই কথা বলে ভগবান শ্রীহরি সেখানেই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। স্বয়ং ভগবান আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন, এই কথা অনুভব করে অদিতি নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। কত সৌভাগ্য হলে তা সম্ভব হয়! তিনি পরম ভক্তি সহকারে পতিদেব কশ্যপের সেবা করতে লাগলেন। মহর্ষি কশ্যপ সত্যদর্শী ছিলেন, তাঁর কাছে কোনো কথাই গুপ্ত থাকতে পারে না। তিনি সমাধিযোগে জানতে পারলেন যে, ভগবান শ্রীহরি অংশরূপে তাঁর দেহে প্রবেশ করেছেন। তিনি সমাহিত হয়ে তপস্যার সাহায্যে চির সঞ্চিত বীর্যকে অদিতির মধ্যে স্থাপন করলেন, যেমন বায়ু কাষ্ঠমধ্যে অগ্নিকে স্থাপন করে। যখন ব্রহ্মা জানতে পারলেন যে, স্বয়ং সনাতন ভগবান অদিতির গর্ভে অবস্থান করছেন তখন তিনি ভগবানের গুহ্য নাম উচ্চারণ করে স্তব করতে লাগলেন।
ব্রহ্মা বললেন—"সমগ্র কীর্তির আশ্রয় স্বরূপ হে ভগবান! আপনার জয় হোক। অনন্ত শক্তির অধিষ্ঠাতা, আপনার চরণে নমস্কার। হে ব্রহ্মণ্যদেব! আপনি ত্রিগুণাত্মক, আপনার চরণে আমার বারবার প্রণাম। হে পৃথি গর্ভজাত! সমস্ত বেদকে আপনি নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন। আপনিই সকলের বিধাতা। আপনাকে আমি বারবার প্রণাম করি। এই ত্রিলোক আপনার নাভিস্থলে অধিষ্ঠিত। এই তিন লোকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বৈকুণ্ঠে আপনি বাস করেন। আপনি অন্তর্যামী হয়ে সকল জীবের হৃদয়ে সর্বদা বাস করেন। এইরূপ সর্বব্যাপী বিষ্ণু ভগবানকে আমি প্রণাম করি। হে প্রভু! আপনি এই বিশ্বসংসারের আদি ও অন্ত, সুতরাং মধ্যও আপনি। সেইজন্য বেদ আপনাকে অনন্তশক্তিপুরুষ বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন গভীর জলস্রোত জলমগ্ন তৃণাদি সবকিছুকেই আকর্ষণ করে তদ্রূপ আপনি কালরূপে এই বিশ্ব সংসারকে আকর্ষণ করে থাকেন। আপনি স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রজা ও প্রজাপতিদের সৃষ্টি কর্তা। হে দেবাদিদেব ! নৌকা যেরূপ জলমগ্ন ব্যক্তিগণের আশ্রয়স্থল, তেমনই স্বর্গচ্যুত দেবতাদের একমাত্র আশ্রয় আপনিই।

(অতএব পুনরায় আপনি তাঁদের স্বর্গে অধিষ্ঠিত করুন)।
শ্রীশুকদেব বললেন-হে রাজন! ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর শক্তি আর লীলার এইভাবে স্তুতি করলে জন্ম-মৃত্যুরহিত ভগবান শ্রীহরি অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হলেন। ভগবান চতুর্ভুজরূপে হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেছিলেন। পদ্মের মতোই তাঁর কোমল নয়ন এবং তিনি পীতাম্বর পরিধান করেছিলেন। বিশুদ্ধ শ্যামবর্ণ দেহ। মকর কুণ্ডলের আভায় বদনমণ্ডল আরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, হস্তদ্বয়ে কঙ্কন, বাহুদ্বয়ে বলয়, মাথায় কিরীট, কোমরে চন্দ্রহার ও চরণে নূপুর তাঁর শোভা বর্ধন করছে। শ্রীহরি গলদেশে মনোহারিণী স্বকীয় বনমালা ধারণ করেছেন যার চতুর্দিকে ভ্রমর দলের গুঞ্জন মুখরিত করে তুলছে। তাঁর কণ্ঠে কৌস্তভ মণি শোভা পাচ্ছে। তাঁর অঙ্গের কান্তিচ্ছটায় প্রজাপতি কশ্যপের ঘরের অন্ধকার দূরীভূত হল। সেই সময় দিকসকল নির্মল হল। নদী ও সরোবরের জল স্বচ্ছ হয়ে গেল। প্রজাদের হৃদয়ে আনন্দের বাণ ডাকল। ঋতুরা নিজেদের সব গুণ প্রকাশ করতে লাগল। স্বর্গ, অন্তরিক্ষ, পৃথিবী, দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণ এমন কী পর্বতের হৃদয়েও আনন্দের সঞ্চার হল। ভগবানের আবির্ভাবকালে চন্দ্র শ্রবণ নক্ষত্রে অবস্থান করছিলেন। ভাদ্র মাসের শুরু পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণ নক্ষত্রে অভিজিৎ মুহূর্তে শ্রীভগবান আবির্ভূত হলেন। সকল নক্ষত্র ও তারকা ভগবানের জন্মের মঙ্গলময় ক্ষণের সূচনা করেছিল। হে রাজন! যে তিথিতে ভগবানের জন্ম হল, তাকে 'বিজয়া দ্বাদশী' তিথি বলা হয়। জন্মের সময় সূর্যদেব ঠিক মধ্যগগনে অবস্থান করছিলেন। ভগবানের আবির্ভাবকালে শঙ্খ, ঢোল, মৃদঙ্গ, পনব, আনক প্রভৃতি বাদ্য বাজতে লাগল। এই সমস্ত বাদ্য এবং আর অনেক বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের তুমুল ধ্বনি উত্থিত হল। অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। প্রধান গন্ধর্বগণ গান করতে লাগলেন। মুনি, দেবতা, মনু, পিতৃপুরুষ এবং অগ্নি ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন। সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, চারণগণ, কিম্পুরুষেরা, কিন্নরগণ, যক্ষ, রাক্ষস, বিহঙ্গ, ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদের অনুচরেরা নৃত্য, গীত ও প্রশংসা করতে লাগলেন এবং অদিতির আশ্রমকে পুষ্পবর্ষার দ্বারা ঢেকে দিলেন। দেবমাতা অদিতি পরমপুরুষ ভগবানকে নিজের গর্ভ থেকে আবির্ভূত হতে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। প্রজাপতি কশ্যপও ভগবানকে নিজ যোগমায়ার দ্বারা শরীর ধারণ করতে দেখে বিস্মিত হয়ে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। ভগবান স্বয়ং অব্যক্ত ও চিৎস্বরূপ। তিনি অলংকার এবং আয়ুধযুক্ত যে কান্তিময় শরীর ধারণ করেছিলেন, সেই শরীরেই কশ্যপ ও অদিতির সামনেই বামন ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করলেন, যেমন নট নিজের বেশ বদল করে। কেনই বা হবে না, ভগবানের লীলা তো অদ্ভুত!



ভগবান বিষ্ণুকে বামন ব্রহ্মচারীর রূপে দর্শন করে মহর্ষিগণের অত্যন্ত আনন্দ হল। তাঁরা প্রজাপতি কশ্যপকে সম্মুখে রেখে তাঁর জাতকর্ম আদি সম্পন্ন করলেন। যখন তাঁর উপনয়নের সময় হল তখন গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং সূর্যদেব বামনকে গায়ত্রীর উপদেশ দিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি দিলেন উপবীত এবং কশ্যপ পরালেন মেখলা। পৃথিবী দিলেন কৃষ্ণসবাচর্ম, বনসমূহের পতি চন্দ্র দিলেন দণ্ড, মাতা অদিতি দিলেন কৌপীন ও কটিবস্ত্র এবং আকাশের দেবতারা বামন বেশধারী ভগবানকে ছত্র প্রদান করলেন। হে মহারাজ ! অবিনশ্বর ভগবানকে বেদগর্ভ ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডুলু, সপ্তর্ষিরা দিলেন কুশ এবং সরস্বতী রুদ্রাক্ষের মালা অর্পণ করলেন। এইরূপে উপনয়ন সংস্কারপ্রাপ্ত ভগবান বামনদেবকে যক্ষরাজ কুবের দিলেন ভিক্ষার পাত্র এবং সতী জগজ্জননী ভগবতী উমা স্বয়ং তাঁকে ভিক্ষা দিলেন। এইরূপে সকলের দ্বারা সম্মানিত বটুকবেশধারী ভগবান বামনদের স্বীয় ব্রহ্মতেজ দ্বারা ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত
সেই সভাতে অতিশয় শোভায়মান হলেন। অনন্তর দ্বিজরূপী ভগবান বামনদের অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে চতুর্দিকে কুশ দ্বারা আস্তরণপূর্বক পূজা ও সমিধদ্বারা হোম করলেন। এমন সময় ভগবান বামনদেব শুনলেন, সর্বগুণসম্পন্ন যশস্বী বলি ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের আদেশে অনেকগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন। তখন তিনি সেখানে যাওয়ার

জন্য যাত্রা করলেন। ভগবান সমস্ত শক্তিযুক্ত। তাঁর প্রত্যেক পদক্ষেপেই পৃথিবী কাঁপতে লাগল।

নর্মদা নদীর উত্তর তটে 'ভৃগুকচ্ছ' নামে একটি খুব সুন্দর স্থান আছে। সেখানে ভৃগুবংশীয় ঋত্বিকগণ বলিকে দিয়ে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ সম্পন্ন করছিলেন। তাঁরা দূর থেকে উদীয়মান সূর্যের মতো বামন ভগবানকে দেখতে পেলেন। হে রাজন! বামন ভগবানের তেজে যাজ্ঞিক যজমান বলি এবং অন্যান্য সকলের তেজ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন, যজ্ঞ দেখার জন্য স্বয়ং সূর্যদেব, অগ্নিদেব অথবা সনৎকুমার ঋষি এসে উপস্থিত হয়েছেন কি? ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে এইরূপ আলোচনা করছেন, এমন সময় ভগবান বামনদেব হাতে ছাতা, দণ্ড এবং জল-পূর্ণ কমণ্ডলু নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। তাঁর কটিদেশে মুঞ্জমেখলা, কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত, মৃগচর্মের উত্তরীয় এবং মাথায় জটা। ব্রাহ্মণের বেশে মায়াব্রহ্মচারী ভগবান বামনদেব যখন যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করলেন তখন সশিষ্য ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণরা অগ্নিসহ তাঁর তেজে নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। শ্রীভগবানের ক্ষুদ্র দেহের অনুরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর, মনোরম প্রিয়দর্শন রূপ দেখে বলির অত্যন্ত আনন্দ হল এবং তিনি ভগবানের উপবেশনের জন্য একটি উত্তম আসন প্রদান করলেন। অতঃপর বলি স্বাগত সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা দ্বারা পাদ প্রক্ষালন করে আত্মারাম যোগিগণের চিত্তে আনন্দবর্ধনকারী সেই ভগবান বামনদেবের পূজা করলেন। ভগবানের পাদোদক পরম মঙ্গলজনক। তার দ্বারা জীবের সমস্ত পাপ তাপ ধৌত হয়। স্বয়ং দেবাদিদেব চন্দ্রমৌলি ভগবান মহাদেবও অত্যন্ত ভক্তিভরে তা স্বীয়মস্তকে ধারণ করেছেন। আজ সেই চরণামৃত ধর্মজ্ঞ বলি লাভ করলেন। তিনি ভক্তিভরে তা নিজের মাথায় ধারণ করলেন।

বলি বললেন- "হে ব্রাহ্মণকুমার ! আপনাকে স্বাগত ও নমস্কার জানাই। আদেশ করুন আমি আপনার জন্য কী করতে পারি ? হে আর্য ! মনে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিদের তপস্যার মূর্তি ধারণ করে আপনি আমার সামনে প্রকট হয়েছেন। আজ আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করেছেন, সেইজন্য আমার পিতৃপুরুষরা তৃপ্ত হলেন। আজ আমার বংশ পবিত্র হল। আজ আমার যজ্ঞ সফল হল। হে ব্রাহ্মণকুমার ! আপনার পদ প্রক্ষালন হেতু আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে গেছে এবং বিধিসম্মত যজ্ঞে, অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার যে ফল তা আমি অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়েছি। আপনার এই কোমল চরণদ্বয় এবং আপনার পাদোদকে পৃথিবী পবিত্র হল। হে ব্রাহ্মণকুমার! মনে হচ্ছে আপনি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করছেন। হে পরম পূজ্য ব্রহ্মচারী! আপনি যা কিছু প্রার্থনা করবেন — গাভী, স্বর্ণ, সমস্ত দ্রব্যে পরিপূর্ণ গৃহ, পবিত্র অন্ন, পেয় বস্তু, বিবাহের জন্য ব্রাহ্মণ কন্যা, সুসমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, হস্তী, রথ—সমস্ত কিছুই আপনি আমার কাছে প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আপনি এ সমস্তই আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে পারেন।"

শ্রীশুকদেব বললেন—বলিরাজের কথা ধর্মযুক্ত ও অত্যন্ত মধুর এই কথা শুনে ভগবান বামনদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করে বললেন। শ্রীভগবান বললেন- "হে রাজন্ ! আপনি যা বলেছেন, তা আপনার কুলমর্যাদার অনুরূপ, ধর্মযুক্ত, যশঙ্কর ও মধুর। কেনই বা হবে না? পারলৌকিক হিতকারী ধর্মবিষয়ে আপনি ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্যকে পরম প্রমাণ বলে মনে করেন এবং আপনার প্রবীণ পিতামহ ও পরম প্রশান্ত প্রহ্লাদের আজ্ঞাও পালন করে থাকেন। আপনার বংশে কখনো ধনহীন অথবা কৃপণ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেনি। এমন কখনো হয়নি যে ব্রাহ্মণকে দান করা হয়নি অথবা কাউকে দান করার প্রতিজ্ঞা করে পরে প্রত্যাখান করা হয়েছে। দানের সময় প্রার্থীর প্রার্থনা শুনে এবং যুদ্ধের সময় শত্রুর আহ্বানে পরান্মুখ হয়েছেন এমন ভীত কেউ আপনার বংশে জন্মগ্রহণ করেননি। কারণ আপনার বংশে প্রহ্লাদ অমল যশে শোভা পাচ্ছেন, যেমন আকাশে চন্দ্র শোভা পায়। আপনার বংশে হিরণ্যাক্ষের মতো বীরের জন্ম হয়েছিল। সেই বীর যখন হাতে গদা নিয়ে একাই পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন তখন সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর মতো একজন বীরেরও দেখা পাওয়া যায়নি। যখন ভগবান বিষ্ণু জলের ভিতর থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করছিলেন তখন তিনি সামনে উপস্থিত হলে অতি ক্লেশে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তারপর অনেকদিন পর্যন্ত ভগবান বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের শক্তি ও বীর্যের কথা স্মরণ করে নিজেকে জয়ী বলে মনে করতে পারতেন না। যখন হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু সংবাদ তাঁর ভাই হিরণ্যকশিপু জানতে পারলেন তখন তিনি ভ্রাতৃহন্তাকে বধ করার জন্যে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবানের বাসস্থান বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হলেন। বিষ্ণু ভগবান মায়াবীশ্রেষ্ঠ এবং কালজ্ঞ। যখন তিনি দেখলেন যে, হিরণ্যকশিপু কৃতান্তের ন্যায় শূলহস্তে তাঁকেই আক্রমণ করতে আসছেন তখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। সংসারে মৃত্যু যেমন সর্বদা জীবের পশ্চাদ্ধাবিত হয়, সেইরকম আমি যেখানে যেখানে যাব এই অসুরও আমাকে অনুসরণ করে সেখানে সেখানে যাবে। সুতরাং আমি এর ভিতরে প্রবেশ করি, তাহলে এই অসুর আমাকে আর দেখতে পাবে না, কারণ এ তো বহির্মুখী, অন্তরের কিছুই দেখতে পায় না, শুধু বাইরের বস্তুই দেখতে পায়। হে অসুর শিরোমণি! যে সময় হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু ভগবানকে আক্রমণ করেছিলেন, সেইসময় তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে নিজের দেহকে

সূক্ষ্ম করে অসুরের নাসিকার ভিতর দিয়ে প্রাণবায়ু হয়ে তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলেন। হিরণ্যকশিপু বৈকুণ্ঠের সর্বত্র তাঁকে অন্বেষণ করলেন কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলেন না। তখন ক্রোধে তিনি সিংহনাদ করতে লাগলেন। সেই বীর বিষ্ণু ভগবানকে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, আকাশ, দশদিক এবং সমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র অন্বেষণ করলেন কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেন না। কোথাও তাঁকে দেখতে না পেয়ে বললেন—"সমস্ত জগৎ আমি খুঁজে বেড়িয়েছি, কোথাও তাকে পাইনি। নিশ্চয়ই সে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখান থেকে আর ফেরা যায় না।" (হে রাজন!) এই সংসারে বৈরীভাব মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অজ্ঞানতা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং অহংকার ক্রোধ বৃদ্ধি করে। আপনার পিতা প্রহ্লাদপুত্র বিরোচন ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। এমন কি তাঁর শত্রু দেবতাগণ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তাঁর কাছে তাঁর আয়ু প্রার্থনা করছেন, এই কথা বুঝতে পেরেও তিনি ব্রাহ্মণ বেশধারী দেবতাকে নিজের আয়ু পর্যন্ত দান করেছিলেন। আপনিও শুক্রাচার্যের মতো গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আপনার পূর্বপুরুষ প্রহ্লাদ এবং অন্যান্য যশস্বী বীরগণের আচরিত ধর্ম পালন করছেন। হে দৈত্যেন্দ্র ! আপনি দাত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা। সেইজন্য আমি আপনার নিকট আমার পাদপরিমিত সামান্য ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করছি। হে রাজন ! আমি জানি যে আপনি রাজাধিরাজ এবং উদারচেতা, তথাপি আমি বেশি কিছু প্রার্থনা করছি না। বিদ্বান ব্যক্তিরা প্রয়োজন অনুযায়ী দান গ্রহণ করে থাকেন। প্রয়োজন অনুসারে দানগ্রহণ করলে পাপে লিপ্ত হতে হয় না।"

বলিরাজ বললেন—"হে ব্রাহ্মণকুমার ! আপনার কথা তো প্রবীণদের মতো, কিন্তু আপনার বুদ্ধি শিশুসুলভ। এখনও আপনি বালক, সেইজন্যে নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারেন না। আমি ত্রিলোকের একমাত্র অধিপতি এবং একাধিক দ্বীপ দান করতে পারি। যে আমাকে তার কথা দিয়ে প্রসন্ন করে আমারই নিকট মাত্র তিনপদ ভূমি ভিক্ষা করে, তাকে কী করে বুদ্ধিমান বলি ? হে ব্রহ্মচারিন ! যে একবার আমার কাছে কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করেছে তার আর কারো কাছে কিছু ভিক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং জীবিকা অর্জনের জন্য আপনার যত ভূমির প্রয়োজন আমার থেকে গ্রহণ করুন।"

শ্রীভগবান বললেন- "হে রাজন! সংসারের সমস্ত প্রিয় বস্তুর বিনিময়েও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের ইচ্ছাপূরণ করার ক্ষমতা কারো নেই। যে তিনপদ ভূমিতে সন্তুষ্ট না হয় তাকে নয় বর্ষযুক্ত দ্বীপ দান করলেও সে সন্তুষ্ট হবে না। কারণ, তার মনে তখন সপ্তদ্বীপ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হবে। আমরা জানি যে, পৃথু, গয় প্রভৃতি রাজারা সপ্তদ্বীপের অধিপতি ছিলেন কিন্তু অর্থ ও ভোগ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের তৃষ্ণা পূরণ হয়নি। প্রারব্ধ অনুযায়ী লব্ধ বিষয়ে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, সে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে পারে না, ত্রিভুবনের অধিপতি হয়েও সেই ব্যক্তি দুঃখী থাকে। কারণ তার মনে অসন্তোষের আগুন জ্বলতেই থাকে। সম্পত্তি এবং ভোগ্য বস্তুতে সন্তুষ্ট না হওয়ার জন্যই জীবকে বারবার সংসার চক্রে আবর্তিত হতে হয় কিন্তু যথালব্ধ বিষয়ে সন্তোষ মুক্তির কারণ হয়। যে ব্রাহ্মণ যথালব্ধ বিষয়ে সন্তুষ্ট, তাঁর তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের তেজ অগ্নিতে জলাহুতির ন্যায় শান্ত হয়ে যায়। সন্দেহ নেই যে, আপনি বরদশ্রেষ্ঠ। সেইজন্য আমি শুধুমাত্র তিনপদ ভূমি আপনার নিকট ভিক্ষা চেয়েছি। এতেই আমার কাজ হয়ে যাবে। ধন ততটাই সংগ্রহ করা উচিত যতটা জীবন ধারণেরজন্য প্রয়োজন হয়।"

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান বিষ্ণু এইরকম বললে বলি হাসলেন। তিনি বললেন— "ঠিক আছে, যতটা আপনার ইচ্ছা নিয়ে নিন।" এই কথা বলে ভূমিদানের সংকল্প করার জন্য তিনি জলপাত্র হাতে নিলেন। শুক্রাচার্য সব কিছু জানতেন। তাঁর কাছে ভগবানের এই লীলা গোপন ছিল না। রাজা বলিকে ভূমিদানে উদ্যত দেখে তিনি বলিকে বললেন। শ্রীশুক্রাচার্য বললেন—"হে বিরোচনপুত্র ! ইনি স্বয়ং অব্যয় বিষ্ণু ভগবান। দেবতাদের কার্য সাধন করার জন্যে কশ্যপের স্ত্রী অদিতির গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছেন। তুমি অর্থ না বুঝে এঁকে যে দানের প্রতিজ্ঞা করলে, তা আমি ভালো মনে করি না, এর দ্বারা দৈত্যকুলের মহান অনিষ্ট হবে। স্বয়ং ভগবান নিজের যোগমায়ার দ্বারা এই ব্রহ্মচারী রূপ ধারণ করে উপস্থিত হয়েছেন। ইনি তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য, লক্ষ্মী, তেজ এবং বিশ্ববিখ্যাত যশ-সব অপহরণ করে ইন্দ্রকে দান করবেন। এই বিশ্বরূপ ভগবান তিন পা দিয়ে ত্রিভুবন অধিকার করে নেবেন। মূর্খ! তুমি সর্বস্ব বিষ্ণুকে দান করে নিজে কোথায় থাকবে? এই বিশ্বব্যাপক ভগবান একপদে পৃথিবী এবং দ্বিতীয় পদে স্বর্গ অধিকার করে নেবেন, বিশাল দেহে আকাশকে ঢেকে দেবেন। তখন তৃতীয় পদ কোথায় রাখবে? তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারবে না। এমতাবস্থায় প্রতিজ্ঞা করে দান না দিতে পারার পাপে তোমায় নরকে যেতে হবে। কারণ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে তুমি অসমর্থ হবে। যে দানে নিজের জীবন নির্বাহের জন্য অবশিষ্ট কিছু থাকে না পণ্ডিতেরা সেই দানের প্রশংসা করেন না। যার জীবন নির্বাহ সুষ্ঠুভাবে হয় সেই ব্যক্তিই দান, যজ্ঞ, তপস্যা

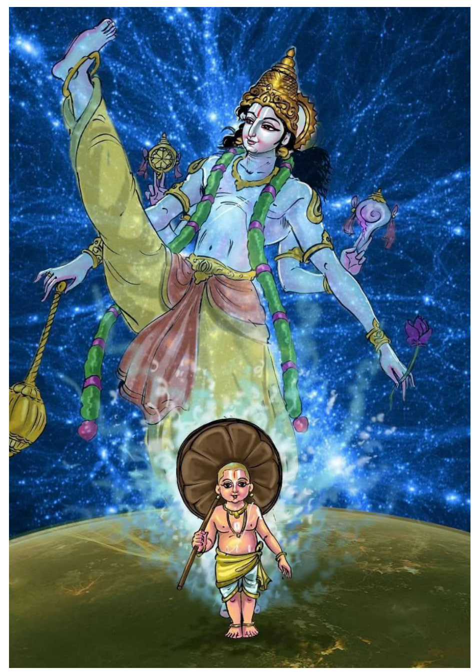
এবং অন্যের উপকার করতে পারে। যে ব্যক্তি নিজের সম্পত্তি পাঁচ ভাগে ভাগ করে কিছু অর্থ যশের জন্য, কিছু ধর্মের জন্য, কিছু অর্থ বৃদ্ধির জন্য, কিছু ভোগের জন্য এবং কিছু অর্থ আত্মীয়স্বজনের জন্য দান করে সেই ব্যক্তিই ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হয়। হে অসুরশিরোমণি! যদি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ অপরাধের চিন্তা মনে জাগে তবে আমি তোমাকে এ

সম্বন্ধে ঋগ্বেদে কী বলেছে - সেই কথা বলছি শোনো। শ্রুতি বলে যে, কাউকে কিছু দান করার অঙ্গীকার করাকে সত্য বলে এবং অস্বীকার করাকে মিথ্যা বলে। (শ্রুতি একথাও বলেছেন যে) এই দেহ বৃক্ষের মতো এবং সত্য এর ফল ও ফুল। কিন্তু যদি বৃক্ষই না থাকে তো ফল ও ফুল কী করে থাকবে? অস্বীকার করা, নিজের দ্রব্য অন্যকে না দেওয়া, অর্থাৎ নিজের জন্য সংগ্রহকে রক্ষা করাই হল এই শরীররূপ বৃক্ষের মূল। যেমন বৃক্ষের মূল না থাকলে বৃক্ষ কিছুদিনের মধ্যেই শুকিয়ে পড়ে যায়, সেইরকম যদি ধন দিতে অস্বীকার না করা হয় তবে এই দেহ শুকিয়ে যাবে সন্দেহ নেই। 'হ্যাঁ আমি দেবো' এই শব্দটি ধনকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। এই উচ্চারণ ধনকে শূন্য করে দেয়; সুতরাং হ্যাঁ কথাটাই অপূর্ণ অর্থাৎ নিজেকে অর্থশূন্য করে দেয়। এই জন্যই যে ব্যক্তি 'হ্যাঁ আমি দেবো' এই বলে ধন দিতে স্বীকার করে তার অর্থ শেষ হয়ে যায়। যে প্রার্থীকে সব কিছু দিতে রাজী হয় তার নিজের ভোগের জন্য কিছুই রাখতে পারে না। এর বিপরীত 'আমি দেবো না'—এই কথা নিজের অর্থকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। কিন্তু এ রকম সব সময় বলা উচিত নয়। যে সবাইকে এবং যে কোনো বস্তুর জন্যই না না করে তার নিন্দা হয়, সে জীবিত থেকেও মৃতের মতোই। (সব সময় সত্য কথা বলবে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যা কথাও নিন্দনীয় নয়, যেমন) নারীকে বশীভূত করার সময়, পরিহাস কালে, বিবাহকালে কন্যা অথবা বরের প্রশংসা করার সময়, নিজের জীবিকা উপার্জনের সময়, প্রাণ সংকটে, গো ও ব্রাহ্মণের উপকারে এবং কাউকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার সময় মিথ্যা তেমন নিন্দনীয় নয়।"

শ্রীশুকদেব বললেন-হে রাজন ! যখন কুলগুরু শুক্রাচার্য বলিকে এইভাবে বললেন, তখন আদর্শ গৃহস্থ রাজা বলি কিছুক্ষণ মৌন থেকে অত্যন্ত বিনয় ও সংযত হয়ে শুক্রাচার্যকে বললেন। রাজা বলি বললেন, "হে ভগবান ! আপনি যা বলেছেন সে সব সত্য। গার্হস্থ্যাশ্রমীদের ধর্ম এই যে, অর্থ, কাম, যশ ও জীবিকাতে যেন কখনো বাধা না আসে। কিন্তু গুরুদেব! আমি প্রহ্লাদের পৌত্র এবং দান দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন আমি বিত্তলোভে প্রতারকের মতো কী করে ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করি? পৃথিবী দেবী বলেছেন, 'অসত্য অপেক্ষা বড় অধর্ম আর নেই। আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু মিথ্যাবাদীর ভার আমি সহ্য করতে পারি না। আমি নরক থেকে, দারিদ্র্য থেকে, দুঃখ সাগর থেকে, রাজ্যের বিনাশ থেকে এমনকি মৃত্যু থেকেও তত ভয় পাই না, ব্রাহ্মণকে প্রবঞ্চনারূপ অধর্ম থেকে যত ভয় পাই। এই সংসারের সমস্ত কিছুই তো মৃত্যুর পর ত্যাগ করতেই হয়, সেই সব দ্রব্য দিয়ে যদি ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট না করতে পারি তাহলে তাকে (মৃত্যুর পরে) ত্যাগ করে কী লাভ? দধীচি, শিবি প্রমুখ মহাপুরুষগণ দুস্ত্যজ প্রাণ ত্যাগ করেছেন শুধুমাত্র জীবের মঙ্গলের জন্যে; তাহলে ভূমি দানের বিষয়ে এত বিচারের কী প্রয়োজন? হে ব্রহ্মন! যে সকল দৈত্যেন্দ্র এই পৃথিবীকে ভোগ করেছেন, তাদের সমকক্ষ এই পৃথিবীতে কেউ ছিলেন না—কাল তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সব কিছুই গ্রাস করেছে; কিন্তু তাদের যশ এখনও পৃথিবীতে বর্তমান, কাল সেটি গ্রাস করতে পারেনি। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! এমন লোক সংসারে অনেক আছে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে অপরান্মুখ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছে, কিন্তু সৎপাত্রে শ্রদ্ধা সহকারে ধন দান করেছে এমন ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। উদার ও দয়ালু ব্যক্তি অপাত্রে দান করে যদি দুর্গতি প্রাপ্ত হন, সেই দুর্গতিও তাঁর প্রশংসার কারণ হয়; তাহলে আপনার মতো ব্রহ্মবিদদের মনোরথ পূর্ণ করে যদি দুঃখ ভোগ করতে হয় তাতে বলার কী আছে? সুতরাং আমি এই ব্রহ্মচারীর মনোরথ নিশ্চয়ই পূর্ণ করব। হে মহর্ষি ! আপনারা বেদোক্ত যজ্ঞাদিতে নিপুণ ; শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞে যাঁর অর্চনা করে থাকেন, সেই বিষ্ণু ভগবান আমার প্রতি বরদাতারূপে কিংবা অন্য কোনো রূপে (শত্রুরূপে) আসুন, আমি এর ইচ্ছা অনুযায়ী এঁকে ভূমি দান করব। অপরাধ না করা সত্ত্বেও যদি ইনি আমায় বদ্ধ করেন তবু আমি এঁর অনিষ্ট করব না। কারণ আমার শত্রু হয়েও ইনি আমার ভয়ে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করেছেন। যদি ইনি অমর কীর্তি ভগবান বিষ্ণু হন তবে নিজের যশকে পরিত্যাগ করবেন না (নিজের কথা অনুযায়ী দানই নেবেন), আমায় যুদ্ধে বধ করে আমার রাজ্য
অপহরণ করতে পারেন। আর যদি অন্য কেউ হন, তবে আমার হাতে নিহত হয়ে রণভূমিতে শয়ন করবেন।"

শ্রীশুকদেব বললেন—যখন শুক্রাচার্য দেখলেন যে, শিষ্য গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাঁর আজ্ঞার অবমাননা করছেন তখন তিনি দৈববশীভূত হয়ে তাঁকে (শিষ্য বলিকে) শাপ দিলেন—যদিও তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও উদার ছিলেন বলে অভিশাপের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না। শুক্রাচার্য বললেন— "মূর্খ ! তুমি তো অজ্ঞান, কিন্তু নিজেকে বড় পণ্ডিত মনে

করছ। আমাকে উপেক্ষা করে তুমি গর্ব করছ। আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছ। সেইজন্য তুমি শীঘ্রই লক্ষ্মীভ্রষ্ট হবে।"
রাজা বলি মহাত্মা ছিলেন। গুরুর দ্বারা অভিশপ্ত হয়েও তিনি সত্য থেকে বিচ্যুত হলেন না। বামনদেবকে বিধিপূর্বক পূজা করে এবং হাতে জল নিয়ে তিনি তিন পদ ভূমি দানের সংকল্প করলেন। সেই সময় বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলি মুক্তামালায় সুসজ্জিতা হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি নিজ হাতে, বামন ভগবানের পাদ প্রক্ষালনের জন্যে স্বর্ণ-কলশে জল নিয়ে এলেন। যজমান বলি স্বয়ং আনন্দে (বামনদেবের) সুন্দর চরণ যুগল ধৌত করে জগৎপবিত্রকারী সেই চরণামৃত স্বমস্তকে ধারণ করলেন। সেইসময় স্বর্গে দেবতা, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ — সকলে রাজা বলির এই কপটতাহীন কার্যের প্রশংসা করে তাঁর উপর দিব্য পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। একসঙ্গে হাজার হাজার দুন্দুভি বেজে উঠল। গন্ধর্ব, কিম্পুরুষ এবং কিন্নরেরা গান করতে লাগল এবং ধন্য ধন্য রব উঠল। উদার শিরোমণি বলি সুদুস্কর কাজ করেছেন, জেনেশুনেও শত্রুকে ত্রিভুবন দান করে দিলেন।
এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। অনন্ত ভগবান শ্রীহরির সেই ত্রিগুণাত্মক বামনমূর্তি বর্ধিত হতে লাগল। সেই বৃদ্ধি এমন হল যে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিকসকল, স্বর্গ,পাতাল, সমুদ্র, পশুপক্ষী, মানুষ, দেবতা এবং ঋষি সব তাঁরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ঋত্বিক, আচার্য ও সদস্যদের সঙ্গে বলি সমস্ত ঐশ্বর্যের একমাত্র প্রভু ভগবানের সেই ত্রিগুণাত্মক দেহে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়, অন্তঃকরণ ও সমস্ত জীবের সঙ্গে এই ত্রিগুণময় বিশ্বকে দর্শন করলেন। তখন ইন্দ্রসেন রাজা বলি বিশ্বমূর্তি ভগবানের পদতলে রসাতল, পদদ্বয়ে পৃথিবী, জঙ্ঘাদ্বয়ে পর্বত, জানুদেশে পক্ষী এবং ঊরুতে বায়ুসমূহকে দর্শন করলেন। এইভাবে ভগবানের বস্ত্রে সন্ধ্যাকে, গুহ্যস্থানে প্রজাপতিদের, জঘনে নিজের সঙ্গে সমস্ত অসুরদের, নাভিতে আকাশ, কুক্ষিতে সাত সমুদ্র এবং বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রদের দেখতে পেলেন। হে রাজন! অসুররাজ, ভগবান মুরারির হৃদয়ে ধর্ম, স্তনদ্বয়ে প্রিয়বাক্য ও সত্য, মনে চন্দ্র, বক্ষঃস্থলে পদ্মহস্তা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী এবং কণ্ঠে সামবেদ ও বর্ণসমূহ দর্শন করলেন। তাঁর বাহুতে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের, কর্ণদ্বয়ে দিকসকল, মস্তকে স্বর্গ, কেশরাশিতে মেঘমালা, নাসিকাতে বায়ু, চক্ষুতে সূর্য এবং মুখে অগ্নিকে দেখা গেল। সেই পরমপুরুষের বচনে বেদসমূহ, রসনায় বরুণদেব, হৃদয়ে বিধি ও নিষেধশাস্ত্র, পলকে দিন ও রাত্রি, কপালে ক্রোধ এবং অধরে লোভ দেখা গেল। হে রাজন্ ! তাঁর স্পর্শে কাম, বীর্যে জল, পৃষ্ঠদেশে অধর্ম, পদন্যাসে যজ্ঞ, ছায়াতে মৃত্যু, হাসিতে মায়া এবং শরীরের রোমকূপ-রাশিতে সব রকমের ঔষধি দৃষ্ট হল।মহাবীর বলি তাঁর নাড়িতে নদীসমূহ, নখগুলিতে শিলসকল, বুদ্ধিতে ব্রহ্মাকে, ইন্দ্রিয়সমূহে দেবগণ ও ঋষিগণকে এবং সমস্ত শরীরে বিশ্বচরাচরকে দর্শন করলেন।



হে রাজন! সমস্ত জগৎকে ভগবানে স্থিত দেখে অসুরেরা সকলে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সেই সময় শ্রীভগবানের হাতে ধৃত ছিল অসহাবল সুদর্শন চক্র, মেঘের মতো গর্জনশীল শাসধনু, মেঘের মতো গম্ভীর নিনাদকারী পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বিষ্ণুর বেগবতী কৌমোদকী গদা, শতচন্দ্র-চিহ্নযুক্ত বিদ্যাধর নামক অসি এবং অক্ষয়বাণপূর্ণ দুটি তূণ। সেই সময় লোকপালগণের সঙ্গে সুনন্দ আদি মুখ্য পার্ষদগণ ভগবানের স্তব করছিলেন। ভগবানের শোভা অপূর্ব দেখাচ্ছিল। তাঁর মস্তকে মুকুট, বাহুতে অঙ্গদ, কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল, বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলদেশে কৌস্তভ মণি, কটিদেশে মেখলা এবং স্কন্ধে পীতাম্বর শোভা বর্ধন করছিল। তিনি পাঁচ প্রকার পুষ্পমালা গলদেশে ধারণ করেছেন যার চতুর্দিকে মধুলোভী ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছে।
তিনি একপদে বলির সমস্ত রাজ্য, দেহদ্বারা আকাশ এবং বাহুসমূহ দ্বারা দিকসকল আবৃত করলেন। দ্বিতীয় পদে স্বর্গকে আবৃত করলেন। তৃতীয় পদ স্থাপনের জন্য বলির নিকট সামান্যতম স্থানও থাকল না। ভগবানের সেই দ্বিতীয় পদই উপরের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হতে হতে মহর্লোক, জনলোক ও তপোলোকের উপরে সত্যলোকে পৌঁছে গেল। শ্রীভগবানের সত্যলোকে আগত চরণকমলের নখদ্যুতিতে সেখানকার আভা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সেই দ্যুতিতে ব্রহ্মাও নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন। তখন তিনি মরীচি আদি ঋষি ও সনন্দনাদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের সঙ্গে ভগবানের চরণকমলের সেবায় উপস্থিত হলেন। বেদ, উপবেদ, নিয়ম, যম, তর্ক, ইতিহাস, বেদাঙ্গ ও পুরাণ সংহিতা এবং যোগ

সমীরণ দ্বারা জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করে যাঁদের কর্মমল ভস্ম হয়েছে সেই মহাত্মাগণ সকলেই এসে ভগবানের সেই চরণের বন্দনা করলেন, যে চরণ-কমলের মহিমায় ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়, কর্মদ্বারা যা লভ্য নয়। ব্রহ্মার কীর্তি অত্যন্ত পুণ্যময়। তিনি ভগবান বিষ্ণুর নাভি থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। বন্দনা করার পর তিনি ভগবানের ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত শ্রীচরণকে অর্ঘ্য জল দিয়ে প্রক্ষালন করে পূজা করলেন। পূজা শেষে ভক্তিভরে তাঁর স্তুতি করলেন।

হে নরেন্দ্র! ব্রহ্মার কমণ্ডলুর সেই জল ভগবানের পাদপ্রক্ষালনহেতু পবিত্র এবং সেটি গঙ্গার রূপ ধারণ করে আকাশ পথে পৃথিবীতে নিপতিত হয়ে ত্রিভুবনের লোকদের পবিত্র করছে। এই গঙ্গা শ্রীভগবানের মূর্তিমতী কীর্তি। শ্রীভগবান স্বীয় বিভূতিকে সম্বরণ করে পুনরায় বামনরূপ ধারণ করলে ব্রহ্মা প্রমুখ লোকপালগণ অনুচরদের সঙ্গে নিজ প্রভুকে অনেক প্রকার উপহার অর্পণ করলেন। তাঁরা শীতল জল, সুন্দর মালা, সুরভিত চন্দন ও অনুলেপন, সুগন্ধ ধূপ, দীপ, লাজ, আতপ তণ্ডুল, ফল, তাঁর মহিমা, বীর্য ও মাহাত্ম্য উল্লেখ করে স্তোত্র পাঠ এবং নৃত্য-গীত, শঙ্খ এবং দুন্দুভির বাদ্যসহ তাঁর (শ্রীভগবানের) আরাধনা করলেন। তখন অক্ষরাজ জাম্বুবান মনের ন্যায় দ্রুতগতিতে দৌড়ে ভেরী বাজাতে বাজাতে ভগবানের বিজয় ঘোষণা করলেন।

অসুররা দেখল, বামনদেব তিন পদ ভূমি নেওয়ার ছলনায় সমস্ত পৃথিবী কেড়ে নিলেন। তারা ভাবল যে আমাদের প্রভু এ সময় যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছেন, উনি তো কিছু বলবেন না। সেইজন্য তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল। এ ব্রাহ্মণ নয়। এ সর্বশ্রেষ্ঠ মায়াবী বিষ্ণু। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দেবতাদের কার্য-সিদ্ধ করতে এসেছে। যখন আমাদের প্রভু যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে যে কোনো প্রকার দণ্ড দানে বিরত হয়েছেন তখন এই শত্রু ব্রহ্মচারীর বেশ ধরে প্রথমে ভিক্ষা ও পরে আমাদের সর্বস্ব অপহরণ করল। আমাদের প্রভু সর্বদা সত্যনিষ্ঠ এবং যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায় বিশেষভাবে এ দিকে লক্ষ্য রাখছেন। ব্রাহ্মণ ভক্ত ও দয়ালু হওয়ায় আমাদের প্রভু কখনোই মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের উচিত শত্রুকে বধ করা। একে বধ করলে আমাদের প্রভুর সেবা করাও হবে। এই কথা ভেবে বলির অনুচররা নিজের নিজের অস্ত্র হাতে তুলে নিল। হে রাজন্ ! বলির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তারা ক্রোধে শূল ও পট্টিশ নিয়ে ভগবান বামনকে বধ করার জন্য ধাবিত হল। হে রাজন! ভগবান বিষ্ণুর পার্ষদরা অসুরদের ভগবানের দিকে দৌড়ে আসতে দেখে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের বাধা দিলেন। অনন্তর অযুত হস্তিতুল্য বলশালী নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিশ্বকসেন, গরুড়, জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত ও সাত্বা- এই সকল ভগবানের পার্ষদগণ অসুর সেনাদের বধ করতে লাগলেন। যখন রাজা বলি দেখলেন যে, ভগবানের পার্ষদেরা তাঁর সৈন্যদের বধ করছেন এবং তাঁর সৈন্যরা ক্রোধের বশীভূত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন তিনি শুক্রাচার্যের অভিশাপের কথা স্মরণ করে তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করলেন। তিনি বিপ্রচিত্তি, রাহু, নেমি প্রভৃতি অসুরদের সম্বোধন করে বললেন- "হে ভ্রাতৃগণ! আমার কথা শোনো। যুদ্ধ কোরো না। এই সময় আমাদের অনুকূল নয়। হে দৈত্যগণ! যে কাল সর্বভূতের সুখ-দুঃখপ্রদাতা তাকে কোনো ব্যক্তিই নিজ-পৌরুষে অতিক্রম করতে সমর্থ হয় না। যে কালরূপী ভগবান পূর্বে আমাদের উন্নতি ও দেবতাদের অবনতির কারণ হয়েছিলেন, তিনিই এখন আমাদের অবনতি ও দেবতাদের উন্নতির কারণ হয়েছেন। বল, মন্ত্রী, বুদ্ধি, দুর্গ, মন্ত্র, ঔষধ এবং সামাদি উপায়—এদের মধ্যে কোনো কিছুর দ্বারাই কিংবা এদের মিলিত সাহায্যেও কেউ কালকে জয় করতে পারে না। যখন দৈববল তোমাদের অনুকূলে ছিল তখন তোমরা ভগবানের এই পার্ষদদের অনেকবার যুদ্ধে জয় করেছ। কিন্তু দেখ তারাই এখন যুদ্ধে আমাদের পরাজিত করে সিংহনাদ করছে। যখন দৈব আমাদের অনুকূল হবে তখন আমরা বিজয়ী হব। অতএব সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করো, যা আমাদের কার্যসিদ্ধির অনুকূল হবে।"

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! দৈত্য ও অসুর সেনাপতিরা বলির কথা শুনে ভগবানের পার্ষদদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রসাতলে প্রবেশ করল। অতঃপর পক্ষীরাজ গরুড় বিষ্ণুর অভিপ্রায় জানতে পেরে অশ্বমেধ যজ্ঞে সোমরস পানের দিনে বলিকে বেঁধে ফেললেন। সর্বশক্তিমান বিষ্ণু কর্তৃক বলি এইভাবে বদ্ধ হলে স্বর্গ ও মর্ত্যে সকল দিকেই হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হল। হে রাজন! যদিও বলিকে বরুণপাশে আবদ্ধ করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করা হয়েছিল তথাপি তাঁর স্থির বুদ্ধি ও উদার কীর্তির কথা সকলেই গান করছিলেন। সেই সময় ভগবান বিষ্ণু বলিকে বললেন। "হে অসুর ! তুমি আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করেছ, কিন্তু দুই পাদেই তো আমি ত্রিলোক অধিকার করে নিয়েছি, এখন তৃতীয় পদের স্থান পূরণ কর। যে স্থান পর্যন্ত সূর্যের তাপ পৌঁছায়, যেখান পর্যন্ত চন্দ্রের এবং নক্ষত্রের কিরণ পৌঁছায় এবং যেখান পর্যন্ত মেঘ বৃষ্টি দান করতে পারে সমস্তই তোমার অধীনে ছিল। আমি এক পদে ভূলোক ও দেহ দিয়ে আকাশ ও দিকসমূহ এবং দ্বিতীয় পদে স্বর্লোক অধিকার করেছি। এইভাবে তোমার সামনেই তোমার সর্বস্ব আমি অধিকার করেছি। তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা পূরণ না করার জন্য এবার তোমাকে নরকে যেতে

হবে। তোমার গুরুর তো এই বিষয়ে মত আছে, সুতরাং তুমি এখন নরকে প্রবেশ করো। যে প্রার্থীকে দান দেবার অঙ্গীকার করে বিমুখ হয় এবং তাকে বঞ্চনা করে, তার সমস্ত মনোরথ ব্যর্থ হয়। স্বর্গে যাওয়া তো হয়ই না, তাকে নরকে বাস করতে হয়। তোমার বিত্তশালী হওয়ার খুব অহংকার ছিল। তুমি আমায় 'দেবো' বলে প্রতিজ্ঞা করে বিমুখ হয়েছ। এখন তুমি কয়েক বছর এই মিথ্যার জন্য নরক ভোগ করো।"

শ্রীশুকদেব বললেন- হে রাজন! এইভাবে শ্রীভগবান অসুররাজ বলিকে গঞ্জনা করে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বলি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বললেন। অসুররাজ বলি বললেন- হে দেবগণের আরাধ্যদেব! হে পবিত্রকীর্তি! আপনি আমার কথা মিথ্যা বলে মনে করেছিলেন কিন্তু তা হয়নি। আমি আমার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করব। আপনি প্রবঞ্চিত হবেন না। আপনি কৃপা করে আপনার তৃতীয় পদ আমার মাথায় রাখুন। আমার নরকে গমন বা রাজ্যচ্যুতি হেতু কোনো ভয় নেই। আমি পাশবন্ধন কিংবা অপার দুঃখেও ভীত নই। কর্পদক শূন্য অথবা আপনা কর্তৃক নিগৃহীত হলেও আমি ভয় পাই না। এ সমস্ত আমার ভয়ের কারণ নয়। আমি একমাত্র অপকীর্তিকে ভয় করি। পূজ্যতম কর্তৃক প্রদত্ত দত্ত মানুষের নিকট বাঞ্ছনীয়। কারণ সেই দণ্ড মাতা, পিতা, ভ্রাতা কিংবা বন্ধু মোহবশত দিতে পারেন না। আপনি ছদ্মবেশে আমাদের অসুরদের পরমগুরু, যেহেতু মদ্গর্বিত আমাদের মদ-বিনাশক জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের যা উপকার করেছেন তা আর কী বলব? যোগীরা কঠোর তপস্যা করে যে সিদ্ধি লাভ করেন, আপনার সঙ্গে শত্রুতা করে অনেক অসুর সেই সিদ্ধি লাভ করেছে। এত যাঁর মহিমা, যাঁর এত অনন্ত লীলা, তিনি অনুগ্রহ করে আমায় দণ্ড দিয়ে বরুণ পাশে বেঁধেছেন। এর জন্য আমি লজ্জিত বা ব্যথিত নই। আমার পিতামহ প্রহ্লাদের কীর্তি জগতে প্রসিদ্ধ। তাঁকে আপনার ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর আপনার সঙ্গে শত্রুতা থাকায় প্রহ্লাদকে তিনি অনেক কষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু তিনি (প্রহ্লাদ) আপনার একান্ত অনুগত হয়ে স্বীয় জীবন আপনাকেই উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি চিন্তা করে স্থির করেছিলেন যে, শরীর তো একদিন শেষ হয়েই যাবে তাহলে একে রেখে কী হবে ? যারা সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য আত্মীয় হয়েছে, সেইসব দস্যুদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কী হবে? স্ত্রীর দ্বারাই বা কী লাভ হবে, সে তো জন্ম-মৃত্যুর সংসারে কেবল আসা-যাওয়ার কারণ হয়। যখন এই দেহই মরণশীল তখন ঘরবাড়ির কথা চিন্তা করে কী হবে? এইসব বিষয়ের কথা চিন্তা করে মন ব্যস্ত করলে শুধুমাত্র আয়ু নষ্ট করা হয়। হে সত্তম (ভগবান)! এইরূপ নিশ্চয় করে আমার পিতামহ প্রহ্লাদ, আপাত দৃষ্টিতে আপনি তাঁর আত্মীয়স্বজনের হত্যাকারী শত্রু



হলেও আপনার অকুতোভয় ও অবিনাশী চরণকমলকে আশ্রয় করেছিলেন। কেনই বা করবেন না, তিনি যে বৈরাগী, অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন, উদার হৃদয় এবং শ্রেষ্ঠ মহাত্মা ছিলেন। সেই দৃষ্টিতে আপনিও আমার শত্রু। কিন্তু বিধাতা বলপূর্বক আমাকে ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন। ভালোই হয়েছে, কারণ ঐশ্বর্য হেতু লোকের বুদ্ধি নাশ হয় এবং সে বুঝতে পারে না যে, অনিত্য জীবন মৃত্যুর কবলে পড়ে আছে।"

শ্রীশুকদেব বললেন—হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজন! বলি যখন ভগবানকে এই কথা বলছেন, সেইসময় সহসা পূর্ণ-চন্দ্রের মতো ভগবানের প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদ সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজা বলি তখন অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন, পদ্ম-পলাশনেত্র, আজানুলম্বিত বাহু, উন্নতদেহ, শ্যামল শোভাযুক্ত, পীতাম্বরধারী, পিতামহ প্রহ্লাদকে দেখতে পেলেন। সেই সময় বলি বরুণপাশে বদ্ধ ছিলেন, সেইজন্য পূর্বে প্রহ্লাদকে দেখে যেমন তাঁর পূজা করতেন এখন সেরকম করতে পারলেন না। অশ্রুসজল নয়নে মস্তক অবনত করে রইলেন। তবে মাথা নীচু করে পিতামহকে প্রণাম করলেন। প্রহ্লাদ দেখলেন, ভক্তবৎসল ভগবান সেখানে উপস্থিত আছেন আর সুনন্দ, নন্দ প্রমুখ পার্ষদগণ তাঁর সেবা করছেন। প্রেমে পুলকিত হয়ে উঠল তাঁর দেহ, নয়নে তাঁর আনন্দাশ্রু। ব্যাকুলহৃদয়ে আনন্দে প্রভুর

নিকটে গিয়ে তিনি ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে সাষ্টাঙ্গে তাকে প্রণাম করলেন।
শ্রীপ্রহ্লাদ বললেন—"(হে প্রভু !) আপনিই বলিকে এই ঐশ্বর্যপূর্ণ ইন্দ্রপদ দান করেছিলেন, আবার আপনিই আজ তা হরণ করলেন। আপনার দান যেমন সুন্দর, হরণও তেমনিই সুন্দর। আমার মনে হয়, একে রাজ্যলক্ষ্মী থেকে বিচ্যুত করে আপনি এর প্রতি বিশেষ কৃপা করেছেন, কারণ এই সমৃদ্ধিই
আত্মবিস্মৃতি ঘটায়। ধনসম্পত্তিতে মদমত্ত হয়ে বিদ্বান পুরুষ আত্মবিস্মৃত হয়, অতএব সেই ঐশ্বর্য থাকতে কি কোনো ব্যক্তি যথার্থস্বরূপ আত্মতত্ত্ব জানতে পারে ? অতএব সেই লক্ষ্মীকে অপহরণকারী মহান উপকারী বন্ধু, হে জগদীশ্বর! সকলের অন্তর্যামী ! সর্বলোকের সাক্ষী নারায়ণ আপনাকে প্রণাম।"
শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন! প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রইলেন। তাঁর সমক্ষেই ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুকে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। ঠিক সেই সময় বলির সতী সাধ্বী স্ত্রী বিন্ধ্যাবলি বলিকে বরুণপাশে বদ্ধ দেখে ভয়বিহ্বলা হয়ে ভগবানের চরণে প্রণাম করে করজোড়ে অবনতমস্তকে ভগবানকে বললেন। বিন্ধ্যাবলি বললেন—"হে প্রভু ! আপনি লীলা করার জন্য এই সম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজেদেরকে এই জগতের কর্তা বলে মনে করে। আপনিই এই জগতের কর্তা, পালক ও সংহর্তা। আপনার মায়ায় মোহিত ব্যক্তি নিজেকে কর্তা বলে মনে করে নির্লজ্জের মতো আপনাকে আপনার সম্পদ দান করতে চায়।" শ্রীব্রহ্মা বললেন—"হে ভূতভাবন! হে জগন্ময়! হে দেবাদিদেব! এখন একে আপনি বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। আপনি এর সর্বস্ব হরণ করেছেন, এখন এ নিগ্রহের পাত্র নয়। বলি আপনাকে সমস্ত ভূমি ও স্বপুণ্যকর্মার্জিত স্বর্গলোক এবং সর্বস্ব এমনকি নিজেকে পর্যন্ত আপনার চরণে অর্পণ করেছেন এবং দান করার সময়ও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, তাঁর কোনোরকম ধৈর্য চ্যুতি হয়নি। যে ব্যক্তি কপটতাহীন সরল প্রাণে আপনার শ্রীচরণে শুধুমাত্র জল প্রদান করে এবং কেবল দূর্বা দিয়ে আপনার পূজা করে, সেও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে। আর বলিতো সানন্দে এবং ধৈর্য সহকারে আপনাকে ত্রিলোক দান করেছেন; তবে ইনি কেন দুঃখভাগী হবেন?" শ্রীভগবান বললেন—"হে ব্রহ্মন্ আমি যাকে কৃপা করি তার সর্বস্ব অপহরণ করে থাকি। কারণ, লোকে ধনমদে মত্ত হয়ে আমাকে এবং অন্যদের অবজ্ঞা করে থাকে। জীব সকল প্রারব্ধ কর্মানুসারে বিবশ হয়ে বিভিন্ন যোনিতে জন্মায়, পরে আমারই কৃপায় মনুষ্য দেহ ধারণ করে। মনুষ্য যোনিতে জন্ম লাভ করে বংশ মর্যাদা, কর্ম, যৌবন, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য এবং অর্থ প্রভৃতি হেতু যদি অহংকারী না হয় তবে জানবে যে তার উপর আমার যথেষ্ট কৃপা আছে। উচ্চবংশ প্রভৃতি অনেক কারণ আছে যার জন্য মানুষ অহংকার, ঔদ্ধত্যের বশে সমস্ত মঙ্গলজনক সাধন থেকে বঞ্চিত হয়; কিন্তু আমার ভক্ত কখনো এই সকল বিষয়ে মোহগ্রস্ত হয় না। এই বলি দৈত্য ও অসুর—উভয় বংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও কীর্তি বর্ধনকারী, সে সেইসব মায়াকে পরাজিত করেছে, যাকে পরাজিত করা অত্যন্ত কঠিন। তুমি লক্ষ্য করেছ যে, এত দুঃখ ভোগ করেও সে বিচলিত হয়নি। আমি এর ধনসম্পত্তি অপহরণ করেছি, রাজ্যচ্যুত করেছি, শত্রুরা নানা প্রকার তিরস্কার করেছে, বেঁধে রেখেছে, আত্মীয়পরিজন একে ত্যাগ করেছে, এত যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, এমনকি এর গুরু শুক্রাচার্য পর্যন্ত একে তিরস্কার করে অভিশাপ দিয়েছেন ; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই বলি সত্য ভঙ্গ করেনি। আমি একে ছলনা করেছি, মনের মধ্যে ছল রেখে ধর্মের উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু এই সত্যবাদী ধর্ম পরিত্যাগ করেনি। তাই আমি একে এমন দুর্লভ পদ প্রদান করেছি যা শ্রেষ্ঠ দেবগণও অত্যন্ত ক্লেশে লাভ করেন। সাবর্ণি মন্বন্তরে আমার এই পরম ভক্ত ইন্দ্রত্ব লাভ করবে। ততদিন এ বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত সুতল লোকে বাস করবে। সেখানে যারা থাকে তারা আমার কৃপা অনুভব করতে পারে। সেইজন্য তাদের শারীরিক বা মানসিক রোগ, ক্লান্তি, তন্দ্রা, আলস্য, শত্রু থেকে পরাভব ও উপসর্গ প্রভৃতি দ্বারা ক্লেশ ভোগ করতে হয় না।(পরে বলিকে সম্বোধন করে বললেন) মহারাজ ইন্দ্রসেন ! তোমার মঙ্গল হোক। এখন তুমি তোমার আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে সুতললোকে যাও, যেখানে স্বর্গের দেবতারাও বাস করতে ইচ্ছা করেন। শ্রেষ্ঠ লোকপালগণও তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না, অন্যদের তো কথাই নেই। যে দৈত্য তোমার আদেশ লঙ্ঘন করবে আমার চক্র তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। আমি তোমাকে তোমার অনুচরদের এবং তোমার ভোগ্যবস্তুগুলিকে সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করব। হে বীর! তুমি সর্বদা আমাকে তোমার কাছেই দেখতে পাবে। দানব এবং দৈত্যদের সংসর্গে তোমার মধ্যে যে আসুরিক ভাব জাগবে, আমার প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গেই তা বিনষ্ট হবে।"
শ্রীশুকদেব বললেন—পুরাণ পুরুষ ভগবান এই কথা বললে সাধুদের প্রশংসাভাজন মহানুভব দৈত্যরাজ বলির নেত্রদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে গেল। ভক্তির উদ্রেকবশত তিনি গদগদ স্বরে করজোড়ে বলতে লাগলেন। বলি বললেন–"হে প্রভু! আমি তো আপনাকে ভালোভাবে প্রণাম করিনি, কেবল প্রণাম করার চেষ্টা করেছি মাত্র। তার ফলেই আমি এই সুফল লাভ করলাম, যা আপনার চরণাশ্রিতরাই লাভ করে থাকে। শ্রেষ্ঠ লোকপালগণকে কিংবা দেবতাদের আপনি

কখনো যে দয়া করেননি, আমার মতো নিকৃষ্ট অসুর সহজেই সেই দয়া লাভ করল।"
শ্রীশুকদেব বললেন—বরুণপাশ থেকে মুক্ত বলি বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শংকরকে প্রণাম করে সানন্দে অসুরদের সঙ্গে সুতলে প্রবেশ করলেন। এইভাবে ভগবান বলির নিকট থেকে স্বর্গ রাজ্য গ্রহণ করে ইন্দ্রকে দিয়ে, অদিতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং নিজে ত্রিভুবন পালন করতে লাগলেন। স্বীয় বংশধর পৌত্র বলিকে বন্ধনমুক্ত এবং ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত দেখে প্রহ্লাদের হৃদয় ভক্তিভাবে পূর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি ভগবানের এইভাবে স্তুতি করলেন। শ্রীপ্রহ্লাদ বললেন— "হে প্রভু! আপনি যে কৃপা করলেন সেই কৃপা তো কখনো লক্ষ্মী, ব্রহ্মা এবং শংকরকেও করেননি, অন্যদের কথা আর কী বলব! বিশ্ববন্দিত ব্রহ্মা যাঁর চরণ বন্দনা করেন সেই আপনি অসুরের দ্বারপাল হলেন! হে শরণাগত বৎসল! ব্রহ্মা প্রমুখ লোকপালগণ আপনার চরণকমলের সুধা পান করে সৃষ্টি রচনা করার শক্তি ও অন্যান্য বিভূতি লাভ করেছেন। আমরা তো অসুরযোনি প্রাপ্ত জন্মাবধি কপট ও ক্রূর—আমাদের প্রতি আপনার এই কৃপা কী করে হল যে, আপনি আমাদের দ্বাররক্ষী হলেন? আপনি আপনার অপরিসীম যোগমায়ার সাহায্যে লীলাচ্ছলে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আপনি সর্বজ্ঞ, সকলের আত্মা ও সমদর্শী। তবুও আপনার লীলা বড় বিচিত্র বলে মনে হয়। কল্পতরুর মতো আপনি সকলের বাসনা পূর্ণ করেন কারণ আপনি ভক্তদের স্নেহ করেন। এইজন্য কখনো কখনো ভক্তদের প্রতি পক্ষপাত করেন আর যারা আপনার থেকে বিমুখ তাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহারও করে থাকেন।"
শ্রীভগবান বললেন—"বৎস প্রহ্লাদ ! তোমার মঙ্গল হোক। এখন তুমিও সুতললোকে গমন করো।সেখানে তোমার পৌত্র বলির সঙ্গে আনন্দে থেকে জ্ঞাতিদের সুখী করো। সেখানে তুমি আমাকে সর্বদা গদা হাতে দণ্ডায়মান দেখতে পাবে। আমার দর্শনে তোমার যে আনন্দ হবে তার দ্বারা তোমার সমস্ত কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।"
শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন! অসুর সেনাপতি বিমলবুদ্ধি প্রহ্লাদ, 'যে আজ্ঞা' বলে করজোড়ে ভগবানের আদেশ শিরোধার্য ও বলির সঙ্গে ভগবানকে পরিক্রমা করে তাঁর অনুমতি ক্রমে সুতললোকে প্রবেশ করলেন। হে রাজন! অতঃপর ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদের সভায় অবস্থিত শুক্রাচার্যকে ভগবান শ্রীহরি বললেন। (শ্রীভগবান বললেন)—"হে ব্রহ্মন! আপনার শিষ্য যজ্ঞ করেছে। তাঁর যজ্ঞে যে সব ত্রুটি হয়েছে আপনি তা পূর্ণ করে দিন। কারণ কার্যকালে যদি কোনো দোষ-ত্রুটি হয় তাহলে ব্রাহ্মণের কৃপাদৃষ্টিতে সে সব দূর হয়।" শ্রীশুক্রাচার্য বললেন—"হে ভগবান ! আপনি যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞপুরুষ; আপনাকে সমস্ত কর্মফল সমর্পণ করে বলি যজ্ঞ করেছে ও আপনার পূজা করেছে; সেই যজ্ঞে ত্রুটি কী করে হবে! কারণ মন্ত্র, অনুষ্ঠানের বিধি নিয়ম, দেশ, কাল, পাত্র ও দ্রব্য প্রভৃতি থেকে যে ত্রুটি দেখা যায়, কেবলমাত্র আপনার নাম সংকীর্তনে সে সমস্ত দূর হয়ে যায়, আপনার নাম সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করে। তথাপি হে সর্বব্যাপিন ! যখন আপনি নিজে বলছেন তখন আমি আপনার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করব। কারণ, আপনার আদেশ পালনই জীবের সর্বাপেক্ষা মঙ্গলময় কার্য।"
শ্রীশুকদেব বললেন—ষড়ৈশ্বর্যশালী শুক্রাচার্য ভগবান শ্রীহরির আদেশ অনুসারে অন্য ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে বলির যজ্ঞে যে সমস্ত কার্য অসমাপ্ত ছিল তা পূর্ণ করলেন। রাজন ! এইভাবে ভগবান বামন বলির নিকট থেকে পৃথিবী ভিক্ষা করে শত্রুগণ কর্তৃক অধিকৃত স্বর্গরাজ্য নিজের অগ্রজ ইন্দ্রকে প্রদান করলেন। তারপর প্রজাপতিদের অধিপতি ব্রহ্মা, দেবর্ষি, পিতৃগণ, মনু, দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা, সনৎকুমার ও মহাদেবের সঙ্গে কশ্যপ ও অদিতির সন্তুষ্টি ও সর্বভূতের মঙ্গলের জন্য বামন ভগবানকে সমস্ত লোক এবং লোকপালদের অধিপতির পদে অভিষিক্ত করলেন। হে রাজন! বেদ, সমস্ত দেবতা, ধর্ম, যশ, লক্ষ্মী, মঙ্গল, ব্রত, স্বর্গ এবং অপবর্গ প্রভৃতি সকল বিষয়ের পালন ও মঙ্গলের জন্য (ব্রহ্মা) সর্বশক্তিমান বামন ভগবানকে উপেন্দ্রের পদে অধিষ্ঠিত করলেন। তখন সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর ব্রহ্মার অনুমতি নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বামন ভগবানকে রথে বসিয়ে অন্য লোকপালদের সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে গমন করলেন।
উপেন্দ্রের (বামনদেবের) বাহুবলে হৃতরাজ্য ফিরে পেয়ে এবং বামন ভগবানের ভুজবলে রক্ষিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ও নির্ভয়ে আনন্দ উৎসব পালন করতে লাগলেন। হে রাজন! ব্রহ্মা, শংকর, সনৎকুমার (অর্থান্তরে কার্তিকেয়), ভৃগু প্রভৃতি মুনি, পিতৃগণ, ভূতগণ, সিদ্ধগণ ও বিমানে আরোহী দেবতারা সকলে শ্রীভগবানের এই অদ্ভুত এবং মহান কর্মের প্রশংসা করতে করতে স্ব স্ব ধামে চলে গেলেন এবং তাঁরা সকলেই অদিতিরও প্রশংসা করতে লাগলেন। হে কুরুকুলতিলক! তোমাকে আমি ভগবানের এই সব লীলাকথা শোনালাম। এই লীলাকথা শ্রবণ করলে শ্রোতার সব পাপ বিধৌত হয়ে যায়। ভগবানের অনন্ত লীলা এবং অপার মহিমা। যিনিই ভগবানের মহিমার সম্পূর্ণ বর্ণনা করতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করতে চান। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বশিষ্ঠ বলেছেন, "এমন কোনো ব্যক্তি জন্মাননি কিংবা জন্মাবেন না যিনি ভগবানের মহিমা পূর্ণভাবে বর্ণনা করতে পারেন।"

যিনি দেবতাদের আরাধ্য অদ্ভুত লীলাময় বামন ভগবানের এই চরিত্র গাথা শ্রবণ করেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ অথবা মনুষ্যযজ্ঞে ভগবানের এই লীলাকথা কীর্ত্তন করা হলে সেই কর্ম সু-সম্পন্ন হয়, শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণ এটি অনুভব করেছেন।

এভাবেই বামন অবতারের আখ্যানের পরিসমাপ্তি ঘটে। ক্ষুদ্র বামনরূপে প্রকাশিত হলেও তিনি তাঁর বিরাট রূপে জগতকে আচ্ছন্ন করে দিলেন এবং অসুররাজ বলির অহংকার ভেঙে দিলেন। কিন্তু ভগবানের অনন্ত দয়া এমন যে, পতনের মধ্যেও বলি ভগবানের কৃপাপাত্র হয়ে উঠলেন এবং সুতললোকে চিরসুখলাভ করলেন। এখানেই নিহিত বামন অবতারের শিক্ষা—অহংকার সর্বনাশ ডেকে আনে, কিন্তু ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে মুক্তি ও কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। অতএব বামন অবতারের এই কাহিনী কেবল পুরাণগাথা নয়; এটি মানবজীবনের জন্য বিনয়, ভক্তি ও ঈশ্বরাশ্রয়ের অমোঘ নির্দেশ।

তথ্যসূত্র: শ্রীবিষ্ণুভাগবত পুরাণ (৭ম স্কন্ধ/১৫-২৩ অধ্যায়)



আর্যরা কি বহিরাগত?

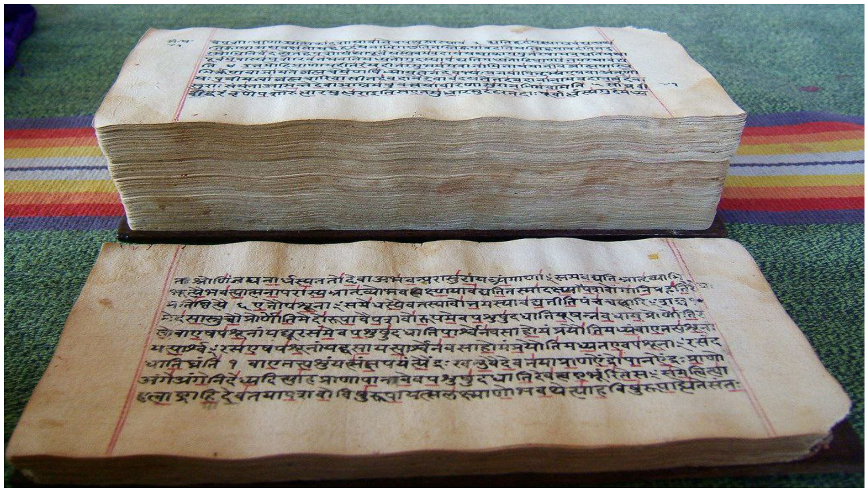
সপ্তর্ষি বসু

বহু শতাব্দী ধরে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষত ইতিহাসবিভাগে এমন একটি তত্ত্বকে পড়ানো হয়ে থাকে যা ভারতের সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করে, এক আর্য,দুই অনার্য। ব্রাহ্মণ ,ক্ষত্রিয় , বৈশ্য এই তিন বর্ণ হচ্ছে আর্য তারা বহিরাগত আর শূদ্রসহ অন্যান্য হচ্ছে অনার্য অর্থাৎ ভারতের মূলনিবাসী, মূলত হরপ্পার অধিবাসী। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে ঋগ্বেদ যা অত্যন্ত প্রাচীন হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র তার সময়কাল হয়ে যায় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দীর পর আর রামায়ণ মহাভারতের রচনা আরো এগিয়ে আসে । আর্যরা যে বহিরাগত এই তত্ত্বকে দুইভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে (১) আর্য আক্রমণ (২) আর্য অভিবাসন। প্রথমদিকে আর্য নামক এক জাতিগোষ্ঠীর আক্রমণ নিয়ে তৈরি করা গালগল্প দিয়ে হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভেদ ও হিন্দুবিদ্বেষী রাজনীতির পথকে প্রশস্ত করা অপরদিকে এই তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হতে শুরু হলে আক্রমণের পরিবর্তে অভিবাসন লাগিয়ে দেওয়া। মূলত যেকোনো উপায়ে বৈদিক ধর্মকে বহিরাগত ধর্ম হিসাবে প্রমাণিত করে SC, ST, muslim (বেশিরভাগ হিন্দু ,পিছিয়ে পড়া ধর্মান্তরিত শ্রেণী) এরাই আসলে ভারতের ভূমিপুত্র এটাই প্রমাণিত করা ইত্যাদি..। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে অনেক ব্যক্তি আর্য আক্রমণকে অস্বীকার করে অভিবাসনে বিশ্বাস করলেও একদল এমনও আছে যারা সেই পরিত্যক্ত আক্রমণ তত্ত্বে বিশ্বাস করে অপরকে বিভ্রান্ত করে এটাই প্রমাণিত করতে উদ্যত যে বর্তমান ভারতের যারা SC, ST আছে হরপ্পা সভ্যতা একমাত্র তাদেরই পূর্বপুরুষদের সভ্যতা যা বহিরাগত বর্বর 'আর্য' নামক এক জাতি আক্রমণের মাধ্যমে সেটাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে এবং তাদের উপরে হত্যালীলা চালায়, যার ভয়ে তারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে যায়।এইভাবেই আস্তে আস্তে আর্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তার লাভ শুরু করে সমগ্র ভারতবর্ষে। আজ এই ছোট লেখাটির মাধ্যমে আমি প্রথমত আর্য আক্রমণ তত্ত্বকে এবং আর্য অভিবাসন তত্ত্বকে কিছু প্রমাণের ভিত্তিতে খন্ডন করার চেষ্টা করব।
আর্য আক্রমণ খন্ডন:- প্রথমত এই অভূতপূর্ব কাল্পনিক তত্ত্বকে খন্ডনের জন্য শুরু থেকে সমগ্র কিছু বুঝতে হবে , তথাকথিত পন্ডিত ও জার্মান বংশোদ্ভূত ম্যাক্সমূলার এই তত্ত্বের প্রবক্তা। তার এই তত্ত্ব বলে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দী নাগাদ সম্ভবত ইরানের দিক থেকে কোন এক বর্বর জাতি যারা যুদ্ধে ও রথ চালাতে অত্যন্ত পারদর্শী তারা হরপ্পা

সভ্যতার উপর আক্রমণ করে এবং সেখানকার অধিবাসীদের হত্যা করে।
এই নরসংহারে অধিকাংশ অধিবাসীই বিভিন্ন প্রান্তে চলে যায়, এরপরই বৈদিক যুগের আরম্ভ হয় অর্থাৎ ভারতে তারা আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। যেহেতু এই তত্ত্ব ম্যাক্সমুলার দ্বারা প্রথম প্রস্তাব করা হয় তাই ম্যাক্সমুলারের মানসিকতা সম্পর্কেও আমাদের একটু জেনে রাখা উচিত। ম্যাক্সমুলার ছিলেন গোঁড়া খ্রিষ্টান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ২৩ অক্টোবর সকাল ৯টায় পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। ফলে ঐ তারিখের আগে ভারতীয় বা কোন কিছু সভ্যতা সংস্কৃতি থাকা বাইবেল অনুসারে অসম্ভব। তাই তার এই পান্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক ভারতীয়দের খ্রিষ্টধর্মে রূপান্তরিত করার গোপন প্রয়াস। বাইবেলের প্রতি মুলারের কতটা বিশ্বাস ছিল? "I look upon the account of creation given in the Genesis as simply historical" [পৃ. ৪১৮-৮২ Life & Letters by Georgina Muller.]



একটি চিঠি তিনি লিখেছিলেন তার স্ত্রীকে ১৮৬৬ সালে। সেখানে বলছেন, "আমার এই পুস্তক (দি স্যাক্রেড বুক্স অফ দি ইষ্ট) ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলবে। তাদের ধর্মের মূলটা কোথায় তারা তা জানতে পারবে। গত তিন হাজার বছর ধরে তারা যা বিশ্বাস করে এসেছে সেই বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করার এইটাই একমাত্র উপায় বলে আমি মনে করি।" ১৮৬৮ সালে তিনি সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া ডিউক অফ আরগিলকে লিখলেন : "ভারতের প্রাচীন ধর্মের শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে, এরপর যদি খ্রিষ্টন ধর্ম সে স্থান দখল করতে না পারে, সেটা কার দোষ? The ancient religion of India is doomed and if Christanity does not step in, Whose fault will it be?" (একই পুস্তক পৃ. ৩৫৭-৩৫৮)। তিনি আর্যকে প্রথমে জাতি গোষ্ঠী বলতেন। ম্যাক্সমুলারের আর্য আক্রমণ তত্ত্ব যে সব বিদ্বানই গ্রহণ করেছিল এমনটা নয়। উইলিয়াম হুইটনী (ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক), থিওডোর গোল্ডটুকার (লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক) -দের মতন সমসাময়িক পন্ডিতেরা ঐ তত্ত্বের বিরোধিতা করতে লাগলেন লিখিতভাবে। আইজ্যাক টেলর নামক এক পাদ্রী ১৮৯০ সালে লিখলেন (Origins of the Aryans;page-39) "আর্যদের আতুরঘর হল সেই দেশ যেখানে সংস্কৃত উচ্চারিত হয়েছিল।" এছাড়াও জুলিয়ান হাক্সলে তিনি "We European" নামক এক প্রবন্ধে বলেন ,"It happened that at the beginning of the nineteenth century the Romantic school in Germany became attrachted to the study of Indian languages. Moreover Max Muller threw another apple of discord. He introduced a proposition which is demonstrably false." এইসবের পর ম্যাক্স মুলার তিনি তার বক্তব্য পরিবর্তন করে বলেন, " Whether the Vedic hymns were composed 1000 or 1500 or 2000 or 2500 years B.C, no power on earth will ever determine." কিন্তু তিনি তার মত পরিবর্তন করলেও ব্রিটিশরা কিন্তু এর প্রচার প্রসার সমান মাত্রায় বজায় রাখে। তার জন্যই তৎকালীন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা জন মার্শাল তিনি হরপ্পার খনন কার্যের সময় বেশ কিছু আঘাত প্রাপ্ত কঙ্কালের প্রমাণ দেখিয়ে আর্য আক্রমণকে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে ওই কঙ্কালের মাথায় যে সমস্ত আঘাতের চিহ্ন আছে তা বিভিন্ন সময়ে মাটিতে থাকার প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত , 1968 থেকে 1972 সাল পর্যন্ত ASI-এর Director General বি. বি. লাল এবং পদ্মশ্রী প্রাপ্ত, আইআইটি গান্ধীনগরের অধ্যাপক এবং ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণা পরিষদের সদস্য (প্রাক্তন) Michel Danino সহ প্রমুখ গবেষকগণ প্রত্নতাত্ত্বিক, অ্যাস্ট্রমিক্যাল বিভিন্ন দিক থেকে আর্য আক্রমণকে খন্ডন করছেন। সম্প্রতি সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব আবিষ্কার হওয়ার পর থেকেই এই ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব

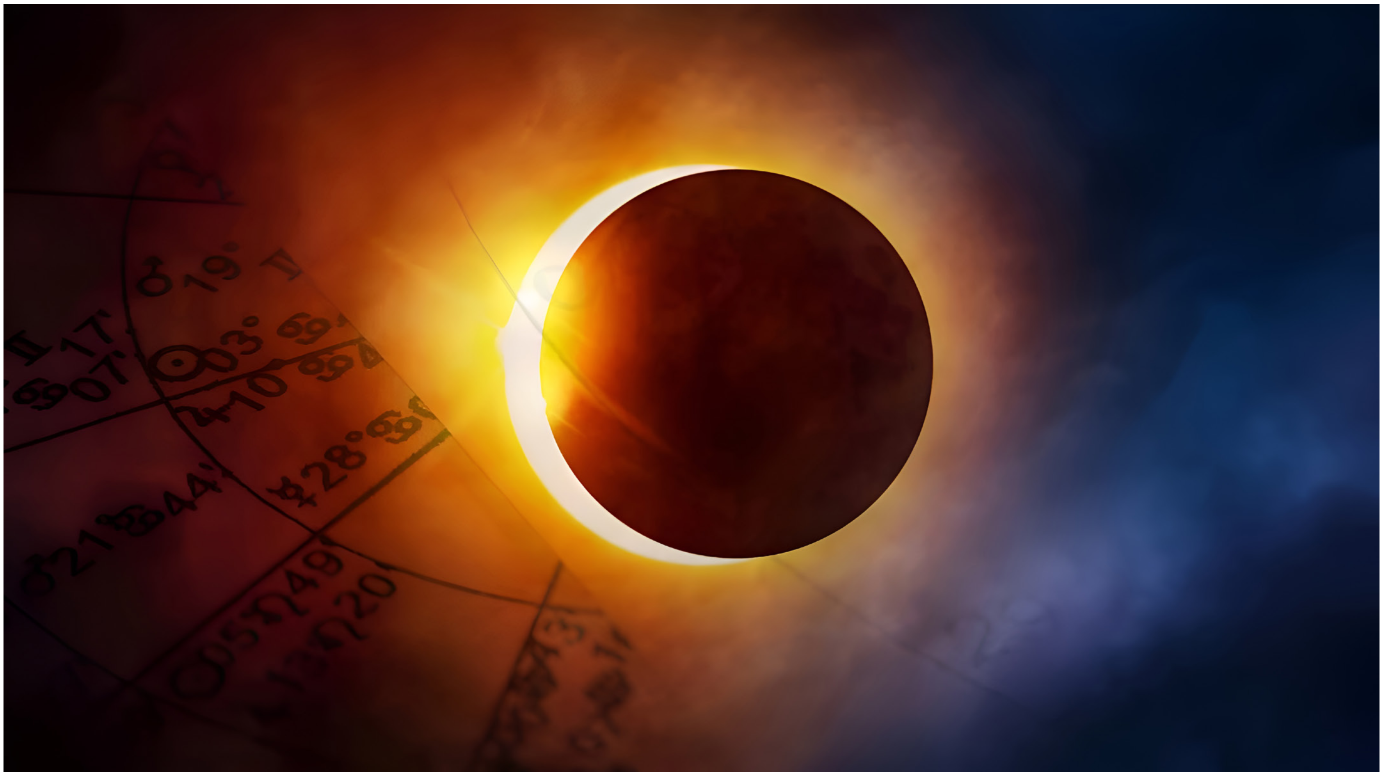


নাগাদ আর্য আক্রমণ পুরোপুরি খারিজ হয়ে যায় , ঋগ্বেদে গঙ্গা নদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে মাত্র একবার। কিন্তু সরস্বতী উল্লিখিত হয়েছে অন্তত ৫০ বার। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪১নং সুক্তের ১৬নং মন্ত্রটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মন্ত্রে সরস্বতীকে বলা হয়েছে অম্বিতয়ে নদীতমে দেবীতমে শ্রেষ্ঠ মাতা, শ্রেষ্ঠ নদী ও শ্রেষ্ঠা দেবী। যমুনার পশ্চিমে আর শতদ্রুর পূর্বে ছিল এর অবস্থান। ঋগ্বেদের ৭ম মন্ডলের ১৫নং সূক্তের ২য় মন্ত্রে বলা হয়েছে এই নদী পাহাড় থেকে সমুদ্রগামী। এই নদী নওধের সন্তানদের (বৈদিক যুগের জনগণ) প্রতিপালন করে। ঋষি শৌনক, গৃৎসমদ, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সকলেই এই নদীর কথা বলেছেন। এই কারণেই যে সভ্যতা বৈদিক যুগে শুরু হয়ে হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতা অব্দি অগ্রসর হয়েছিল তাকে সরস্বতী সিন্ধু সভ্যতা বলাই সঙ্গত। সরস্বতী ছয় থেকে আট কিমি. চওড়া কোথাও কোথাও ১৪ কিমি.। এই নদী তাহলে কোথায় গেল? প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও উপগ্রহ মারফৎ গৃহীত ছবি থেকে জানা যাচ্ছে - সরস্বতী উপনদীগুলির জলের অভাবে ক্রমশঃ দূর্বল হতে শুরু করে এবং ১৯০০-২০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। এই নদীর তীরবর্তী এলাকার বসতির প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। উপগ্রহ ছবি দেখিয়েছে যে ঘগ্গর একসময় খুব বিরাট নদী ছিল। ওয়াকানকার (লুপ্ত সরস্বতী নদী শোধা-হিন্দু-আরাঠী থেকে অনুদিত। ১৯৯২ সাল) দেখিয়েছেন যে একটি বিরাট নদী হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থানের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পতিত হত ভৃগুকচ্ছের কাছে। আমেরিকান উপগ্রহ ল্যান্ডসার্ট ও ফরাসি উপগ্রহ স্পট এই তথ্যকে সমর্থন করেছে। বেদোক্ত সরস্বতী নদীর ভৌগোলিক অবস্থানকে কেন্দ্রীয় সূত্র ধরে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে বৈদিক সভ্যতার সন্ধ্যাকালে সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টি। বৈদিক যুগ খুব কম করে হলেও ৭০০০ খৃ. পূর্বাব্দে শুরু এবং সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার কাল দাঁড়ায় খৃ. পূ. ৩০০০-২০০০ অব্দ। আর্য আক্রমণ তত্ত্ব শুধু প্রত্নতত্ত্বকেই অস্বীকার করেনি ভূগোলকেও বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েছে। তাই ঐ তত্ত্ব অনুসারে খৃ. পূ. ১৫০০ অব্দে আর্য আক্রমণ এবং ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বেদ রচনার কাল সম্পূর্ণ হাস্যকর। সরস্বতী সিন্ধু সভ্যতা খুব কম করেও ৫০০০ বছর পূর্বে ছিল। সিন্ধু নদের তীরবর্তী এলাকায় বসতির প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে। আর্য আক্রমণ তত্ত্ব অনুসারে আগে হরপ্পা সভ্যতা পরে বৈদিক সভ্যতার কাল। এর স্বপক্ষে কোন ধরণের প্রমাণই নাই। এখানকার কথা অনুসারে প্রমাণিত হচ্ছে প্রায় ৫ হাজার বছর ধরে বিস্তৃত বিশাল বৈদিক যুগের শেষ মাথায় সিন্ধু সভ্যতার যুগ এসেছিল। সরস্বতীর ভৌগোলিক অবস্থানে যা জানা গেছে এবং তার তীরবর্তী এলাকাতে যত বসতির প্রমাণ পাওয়া গেছে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে আর্যরা ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিদেশ থেকে এসে সিন্ধু সহ ৫টি নদী অতিক্রম করে সরস্বতী তীরে এসে বসবাস করল কেন যে সরস্বতী ২০০০ খৃ. পূর্বাব্দে শুকিয়ে গেছে? আর সেই শুকিয়ে যাওয়া নদীটিকে অম্বিতাম, নদীতমে, দেবীতমে বলে সাহিত্য রচনা করল ১৫০০ খৃ . পূর্বাব্দের পর? সরস্বতী নদীর শুকিয়ে যাবার ঘটনা তা কিন্তু মহাভারতে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় এর থেকে স্বাভাবিক মহাভারতের প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখন যারা হরপ্পা অধিবাসীদের অবৈদিক বলার চেষ্টা করেন তাদেরও এটা জানা থাকা উচিত হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন যা স্বাভাবিকভাবেই হরপ্পা সভ্যতার সংস্কৃতিকে বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে অর্থাৎ এই দুটো সংস্কৃতি যে একে অপরের পরিপূরক তা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব অধিকর্তা ডঃ বিবি লালেরও অভিমত এবং ভারতবর্ষের যে যোগ পরম্পরা যা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত অক্ষুন্ন ভাবে প্রবাহমান সেই যোগযুক্ত বেশ কিছু পোড়ামাটির ছোট ছোট মূর্তি হরপ্পা থেকে পাওয়া গিয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতির

যে অন্যতম শুভ চিহ্ন স্বস্তিক সেটিও কিন্তু হরপ্পা সভ্যতাতে পাওয়া গিয়েছে এরসাথেই শিবলিঙ্গসহ বিভিন্ন দেবী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। বেশ কিছু বছর আগে কালিবঙ্গান প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সময় অগ্নিবেদী আবিষ্কৃত হয় যা ASI অর্থাৎ Archaeological Survey of India স্পষ্ট জানিয়েছে কালিবঙ্গানের অধিবাসীদের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে এই ধরনের অগ্নিবেদী পাওয়া গিয়েছে যা চতুর্ভুজাকৃতির এবং এটি সেখানকার অধিবাসীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই সম্পর্কে ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA JAIPUR CIRCLE এ বলা হয়েছে ," It consisted of a modest structure, containing four to five fire-altars' and as such could have been used for ritualistic purposes"। অপরদিকে, "along with the remains of fire altars in KLB-1 mentioned above is clear evidence that fire altars played a major role in the religious ife of the people."[Kalibangan: Its Period and Antiquities in Indus Civilization Sites in India New Discoveries edited by Dilip Chakrabarti, Marg Publications, Mumbai, 2004] অগ্নিবেদী বা অগ্নির মাহাত্ম্য বৈদিক ধর্মে কতটা তা আপনি ঋগ্বেদের শুরুতেই প্রথম মন্ডলের প্রথম সূক্তের সব মন্ত্রগুলি অধ্যয়ন করলেই পেয়ে যাবেন যা অগ্নিস্তুতি দিয়ে শুরু হচ্ছে শুধু তাই নয় পুরো সূক্তটাই অগ্নির ও যজ্ঞের প্রতি সমর্পিত। অপরদিকে যে তামিলদের মূলত ভারতের মূলনিবাসী বলে আর্যদের হাতে নির্যাতিত বলা হয় সেই তামিলদের প্রাচীনতম গ্রন্থ তামিল সঙ্গম সাহিত্যে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ থাকলেও বাইরে থেকে এসে কেউ তাদের উপর আক্রমণ করছে বা অত্যাচার করছে এইরকম কোনকিছুর উল্লেখই পাওয়া যায় না। যদি আমরা জিনগত গবেষণার দিকেও নজর দিই তাহলে আমরা দেখতে পাই NIH (National institute of health, United States) তাদের ওয়েবসাইটে পরিষ্কার লিখেছে "No support for Aryan invasion"
অপরদিকে R1a1 (Y chromosomal) নামক হ্যাপলো গ্রুপকে বহিরাগত হিসাবে বলা হয়ে থাকতো কিন্তু JHG (journal of human genetics , Japan) তাদের প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে তারা এটি দেখিয়েছে যে এই হ্যাপলো গ্রুপের উদ্ভব মূলত ভারতে। এই গবেষণা করতে তারা একটি চার্ট বানায় সেখানে তারা এটা দেখায় - Central Asia - 0.24, Europe and near east - 0.31, India (tribes + Dalits) - 0.41, India(brahmins)- 0.34 এই variance এর আছে । এখন স্বাভাবিকই যারা ওই হ্যাপলো গ্রুপকে বহিরাগত বলছিল ওইটি ভারতের tribes and dalits এদের মধ্যে সবথেকে বেশি পাওয়া যায়, যারা তাদের মতে একমাত্র ভারতের মূলনিবাসী। এর মাধ্যমে এই কুযুক্তিরও খণ্ডন হয়ে যায় যে ওই আর্যরা তারা কোন নারী নিয়ে আসেনি ভারতের মূলনিবাসী নারীদের সঙ্গে তারা মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদন করেছিলো, আর এই সমস্ত যুক্তি যারা ছড়ায় তাদের কাছে বহিরাগত আর্য হলো ব্রাহ্মণরাই। তার জন্যই ভারতের JNU এর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে শোনা যেত 'ব্রাহ্মণ ভারত ছাড়ো' ইত্যাদি শ্লোগান।
আর্য অভিবাসন খন্ডনম্:- এখন যখন আর্যদের আক্রমণকে কোনভাবে প্রমাণ করা গেলো না তখন আর্যদের অভিবাসন এই তত্ত্ব নিয়ে কিছু জেনেটিক স্টাডিজ ও তার প্রচার শুরু হলো। এই তত্ত্ব কিন্তু বর্তমানে গবেষণালব্ধ ও বিতর্কিত। এখন পর্যন্ত যতগুলো জেনেটিক স্টাডি হয়েছে এই তত্ত্বকে নিয়ে কোন গবেষণা পত্র পুরোপুরিভাবে এটা প্রমাণিত করতে পারেনি যে আর্য অভিবাসন আদৌ হয়েছে। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক শ্রীকান্ত তালাগিরির পুস্তক "GENETICS & THE ARYAN DEBATE" যা সম্প্রতি কালীন হওয়া বিভিন্ন গবেষণাপত্রের উপর নির্ভরশীল এই পুস্তকটি পাঠকগণ পড়তে পারেন।
আর্যদের ভারত থেকে গমন :- অপরদিকে ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্রে এবং আবেস্তা গ্রন্থের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট জানা যায় যে আর্যরা (সৎগুন সম্পন্ন সম্ভাষণার্থে) তারা পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়েছে কিংবা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে । "The Aryan invasion myth , How 21st Century Science Debunks 19th Century Indology" পুস্তকে লেখক A.L.CHAVDA তিনি বৌধায়ণ শ্রৌত সূত্র (১৮.৪৪) এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে মিতান্নি সভ্যতা যা খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১২৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত উত্তর ইরাক, সিরিয়া এবং তুরস্কে বিস্তৃত ছিল তারা মূলত ভারতীয় বংশোদ্ভুত এবং বৈদিক ধর্ম অনুসারী (ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে তারা বৈদিক ধর্মের অনুসারী ছিল, এমনকি তাদের রাজ্যে থেকেই সংস্কৃতের সব থেকে পুরনো শিলালিপি পর্যন্ত পাওয়া যায়) ছিলেন এবং যেমনটা আগেই দেখানো হয়েছে যে R1a1 এই হ্যাপলো গ্রুপের উদ্ভব মূলত ভারতেই স্বাভাবিকভাবেই সেই মিতান্নি সভ্যতার মানুষদের মধ্যেও এই হ্যাপলো গ্রুপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । অন্যদিকে গবেষকদের মতে জেন্দাবেস্তা অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদের ঠিক পরেই একে গণ্য করা হয় সেখানে বলা হচ্ছে যায় ,"The Aryans

went to Iran from Indian recorded in the Avesta (Vendidad, Fargard 1:1) "[Source: Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, 2006, Vol. 87 (2006), pp.1-37]

যদিও লেখাটি অত্যন্ত ছোট, তবুও আমি চেষ্টা করেছি অতি সংক্ষেপে বিভিন্ন তথ্যকে তুলে ধরে আর্যরা বহিরাগত' এই অপপ্রচারের খন্ডন করতে। কিন্তু এখনো আমাদের পাঠ্যপুস্তকের বই থেকে আক্রমণ তত্ত্ব পুরোপুরি যায়নি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চম শ্রেণির ইতিহাস বইতে এই তত্ত্ব সসম্মানে এখনো রয়েছে, আর ছাত্রদের অন্যতম পথপ্রদর্শক সহায়িকা 'রায় মার্টিন' আবার রামকে আর্য এবং রাবণকে অনার্য বলে ব্যাখ্যা করেছে। এখনো আর্য আক্রমণ তত্ত্ব যে প্রত্যেকটা মানুষের মন থেকে বেরিয়ে গেছে এমনটা নয় বিভিন্ন হিন্দুবিদ্বেষী মতাদর্শের ঐতিহাসিকরা বা লেখকরা এখনো নিজেদের লেখায় কিংবা বক্তৃতায় এই পরিত্যক্ত স্বকল্পিত তত্ত্বের সাহায্য নেয়। সে যাই হোক রোমিলা থাপার এর মত বামপন্থী ঐতিহাসিক এই তত্ত্বকে প্রাথমিক দিকে প্রচুর প্রচার করলেও সম্প্রতি উনার গ্রন্থে তিনি স্বীকার করেছেন যে এই তত্ত্বের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই [পূর্বকালীন ভারত] । সর্বশেষ, এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে তাহলে সিন্ধু সরস্বতী সভ্যতার অবসান কিভাবে হল? উপিন্দর সিং (ঐতিহাসিক) যিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং - এর কন্যা তার পুস্তকে তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে , এই সভ্যতার অবসানের প্রধান কারণ হচ্ছে বারংবার বান বন্যায় বিধ্বস্ত হওয়া অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সর্বশেষ এনসিইআরটি এই বিকৃত ইতিহাসকে নিজের পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে এটা অত্যন্ত খুশির খবর।



চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে সনাতন জ্যোতির্বিজ্ঞান

উচ্ছ্বাস তালুকদার

গ্রহণ নিয়ে অনেক বাদ বিতণ্ডা হয়ে থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রচলিত বিশ্বাস সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। অনেকেই বলেন সনাতন শাস্ত্রে (বিশেষ করে পুরাণে) প্রচলিত বিশ্বাসগুলো সম্পর্কে তথ্য রয়েছে কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলছে না বিধায় শাস্ত্র ভুল। এ নিয়ে সনাতনীদের নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব শুরু হয়, কেউ পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রগুলোকে ভুল বলেন তো কেউ আবার যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে সকল শাস্ত্রই অস্বীকার করেন। গ্রহণ বিষয়ক আলোচনা এখনের সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্রহণ বলতে একটি বস্তুর কারণে অন্য একটি বস্তুর আংশিক বা পূর্ণরূপে আড়াল হওয়াকে বোঝায়। যখন তিনটি বস্তু একই সরলরেখায় অবস্থান করে, তখন তাদের মধ্যে একটি বস্তু থেকে বাকী দুইটি বস্তুর মধ্যে সংঘটিত গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করা যায়। যে বস্তুটি আড়াল করে, তাকে বলে গ্রহণকারী বস্তু। আর যে বস্তুটি আড়ালে চলে যায়, তাকে বলে গ্রহণকৃত বস্তু। ভারত উপমহাদেশের গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার ধ্রুপদী যুগের একজন গণিতবিদ, পদার্থবিদ এবং জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের (৪৭৬ - ৫৫০ সাধারণ অব্দ) ভাষায় -

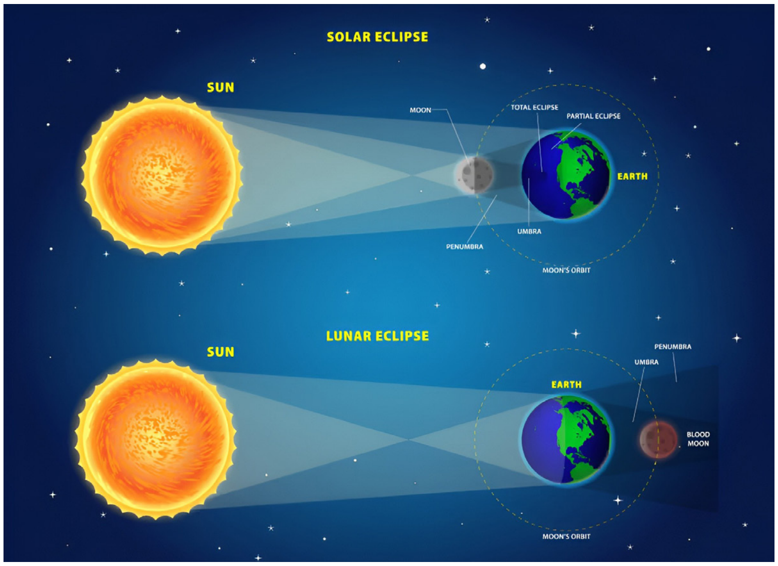
চন্দ্রো জলমর্কোঽগ্নিঃ মৃদ্ভূশ্ছায়াপি যা তমস্তদ্ধি।
ছাদয়তি শশী সূর্য্যং শশিনং মহতী চ ভূচ্ছায়া॥

(আর্যভটিয়া - গোলপাদ - ৩৭)

অনুবাদ: চাঁদ জল, সূর্য আগুন, পৃথিবী মাটি, আর যাকে ছায়া বলা হয় তা হল অন্ধকার (যা পৃথিবীর ছায়ার কারণে ঘটে)।

চাঁদ সূর্যকে আচ্ছন্ন করে এবং পৃথিবীর বৃহৎ ছায়া চাঁদকে আচ্ছন্ন করে।

আর্যভট্ট উক্ত অধ্যায়ে চাঁদকে জল স্বরূপ বা শীতল ও সূর্যকে অগ্নিস্বরূপ বা উত্তপ্ত বলেছেন; এটা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, পূর্ব খণ্ড ৫৮/৩০ এও পাওয়া যায় - 'পঠ্যতে চাগ্নিরাদিত্য ঔদকশ্চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ' অর্থাৎ, সূর্য অগ্নিময় ও চন্দ্র জলময় বলে কীর্তিত। উনি (আর্যভট্ট) ছায়ায় আচ্ছন্ন হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহজে বলতে গেলে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর যখন পরে বা চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে থাকে তখন সূর্য গ্রহণ হয়। আর পৃথিবী যখন



সূর্য ও চাঁদের মাঝে অবস্থান নেয় তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে এবং চন্দ্রগ্রহণ হয়। এগুলো পৃথিবীর সাপেক্ষে বর্ণনা তেমনি চন্দ্রের সাপেক্ষেও সূর্যগ্রহণ ও পৃথিবী দ্বারা গ্রহণ হয়। যেমন - পৃথিবীর সাপেক্ষে যখন চন্দ্রগ্রহণ তখন চাঁদের সাপেক্ষে সূর্যগ্রহণ চলমান থাকে।

পূর্ণিমাতে চন্দ্র গ্রহণ হয় কারণ সূর্য থেকে প্রাপ্ত কিরণ পৃথিবীর দ্বারা বাধা পেতে হয়। আবার সূর্য গ্রহণ অমাবস্যায় হয় কারণ চন্দ্র দ্বারা সূর্য কিরণ বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়। তবে সকল পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতেই গ্রহণ সম্ভব নয়। সেটার কারণ এবার ব্যাখ্যা করা যাক!

লিঙ্গ পুরাণ পূর্ব ভাগ, ৫৭/২২-২৫ এ রয়েছে - 'চন্দ্র, পর্বে উত্তরায়ণ মার্গস্থিত হইলে, উচ্চতাবশতঃ শীঘ্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহার আলোকমালা অপরিস্ফুট থাকে এবং দক্ষিণায়ণ মার্গস্থ হইলে নীচ পৃথিবীকে আশ্রয় করেন। যে সময়ে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে সূর্য ভূমিরেখাবৃত হয়, তখন যথাকালে শীঘ্র অস্তমিত হইয়া থাকেন; সেইজন্য অমাবস্যাতে নিশাকর উত্তরমার্গে অবস্থান করেন; দক্ষিণমার্গে সামান্যরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষরূপে নহে।' পুরাণের ভাষায় চাঁদ কখনো পৃথিবীর উপরের দিকে ও কখনো নিচের দিকে অবস্থান করে। উপরের দিকে অবস্থানকে চন্দ্রের উত্তরায়ণ ও নিচের দিকে অবস্থানকে চন্দ্রের দক্ষিণায়ন মার্গ বলা হয়। চন্দ্রের এই উপরে বা নিচে অবস্থানের কারণ চন্দ্রের কক্ষপথ ৫.১৪৫° হেলে থাকে। সেকারণে সকল পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করতে পারে না। লিঙ্গ পুরাণে আরো রয়েছে -

জ্যোতিষাং গতিযোগেন সূর্যস্য তমসা বৃতঃ।
সমানকালাস্তময়ৌ বিষুবৎসু সমোদয়ৌ।।

(লিঙ্গ পুরাণ - পূর্ব ভাগ - ৫৭/২৬)

অনুবাদ: জ্যোতিসমূহের গতিযোগে চন্দ্রমা, সূর্যের তমোরাশিতে আবৃত হইয়া থাকেন। চন্দ্র সূর্য বিষুবে সমানকালে অস্তমিত ও সমানকালে উদিত হইয়া থাকেন।

অমাবস্যায় পৃথিবীর সাপেক্ষে চন্দ্র ও সূর্য একই রাশি ও নক্ষত্রে অবস্থান করে আর এই অবস্থাকেই চন্দ্র-সূর্যের বিষুবকাল বলা হচ্ছে।

চাঁদের দুটো বিন্দু বা নোড রয়েছে। অনেকের মতে এগুলোই পুরাণে বর্ণিত রাহু কেতু। চন্দ্র নোড হল দুটি বিন্দু যেখানে চাঁদের কক্ষপথ গ্রহণকে অতিক্রম করে, যা মহাকাশীয় গোলকের উপর সূর্যের আপাত বার্ষিক পথ। এই নোড বা বিন্দুর কারণেই মূলত গ্রহণ সম্ভব হয়। এগুলোকে লুনার নোড বলে। যখন নোডগুলি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার সাথে মিলে যায়, যখন সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ ত্রিমাত্রিকভাবে সারিবদ্ধ হয়, তখন ছায়াগুলি একে অপরের সাথে আবদ্ধ হয় (প্রায় প্রতি ১৭৩.৩ দিন অন্তর অন্তর এমন হয়)। চন্দ্রগ্রহণ তখনই ঘটতে পারে যখন পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণের যেকোনো নোডের কাছাকাছি থাকে (১১° ৩৮' দ্রাঘিমাংশের মধ্যে), আর সূর্যগ্রহণ তখনই ঘটতে পারে যখন অমাবস্যা চন্দ্রগ্রহণের যেকোনো নোডের কাছাকাছি থাকে (১৭° ২৫' এর মধ্যে)। আর্যভট্টও চন্দ্রের এই দুই বিন্দু নিয়ে বর্ণনা করেছেন -

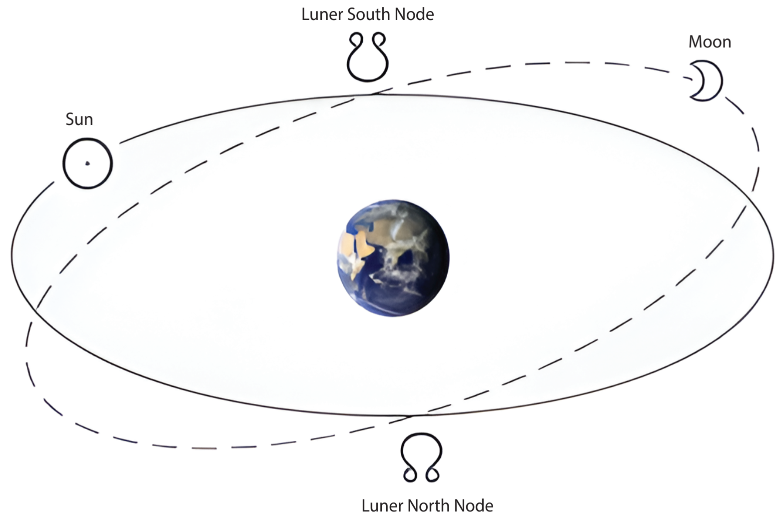
স্ফুটশশিমাসান্তেঽর্কং পাতাসন্নো যদা প্রবিশতীন্দুঃ।
ভূচ্ছায়াং পক্ষান্তে তদাধিকোনং গ্রহণমধ্যম্।।

(আর্যভটিয়া - গোলপাদ - ৩৮)

অনুবাদ: যখন কোনও চান্দ্র মাসের শেষে, চন্দ্র নিকটবর্তী বিন্দুর (নোড) কাছে থেকে সূর্যের মধ্যে প্রবেশ করে, অথবা কোনও পক্ষের (অর্থাৎ চান্দ্র পক্ষ/পক্ষান্তে) শেষে পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করে, তখন তা কমবেশি গ্রহণের মধ্যভাগ নির্দেশ করে — প্রথম ক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চন্দ্রগ্রহণ।

ছায়ায় আচ্ছন্ন হওয়াকে পুরাণে রাহু বলে বর্ণিত করা হয়েছে। ছায়ার দ্বারা গ্রাসকেই মূলত রাহুর গ্রাস বলা হয় -

তুল্যস্তয়োস্ত স্বর্ভানুর্ভূত্বাধস্থাৎ প্রসর্পতি।
উদ্ধৃত্য পার্থিবচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ।।
(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ - পূর্বখণ্ড - ৫৮/৬৩)



অনুবাদ: (স্বর্ভানু) রাহু চন্দ্র ও সূর্যের সমান হইয়া তাহাদের নিম্নদেশে গমন করে। পৃথিবীর উর্দ্ধগত মণ্ডলাকার ছায়াই রাহু।

অতএব, এটা বুঝা গেল যে রাহু দ্বারা গ্রস্ত মানে মূলত ছায়ায় আচ্ছন্ন হওয়াকেই বুঝাচ্ছে তথা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে। হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ কৃত স্মৃতি চিন্তামণি গ্রন্থে আছে - 'চক্ষুদ্বারা যে রাহুর দর্শন, তাহার নাম গ্রহণ; সেই গ্রহণকালে বিহিত কর্ম্ম করিবে; কিন্তু গণনা করিয়া জানাকে গ্রহণ বলে না। (সংবৎসরপ্রদীপ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত)'

দেবী পুরাণ নামক উপ পুরাণে বর্ণিত গ্রহণ বিষয়ক সুন্দর তথ্য রয়েছে -

'ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহামতে! লোকে মূঢ়তা-প্রযুক্ত চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে যে কথা বলে, তদ্বিষয়ে আমার কথা এই, যদি সত্যই তেজোরাশি দিবাকরকে রাহু গ্রাস করে, তো উদরস্থিত সূর্যতেজে রাহু ভস্ম হয় না কেন? অথবা রাহু যদি আক্রমণ করিয়া শত্রু সূর্যকে মুখপ্রবিষ্টই করে, তো সে তীক্ষ্ণ দশন (দংশন বা আক্রমণ) দ্বারা তাঁহাকে শতধা খণ্ড খণ্ড করে না কেন? সূর্য্য মুক্ত হইলে, তেমনই তো তাঁহাকে অখণ্ড-মণ্ডল দেখা যায়। তেজের অপহ্নব, স্থানচ্যুতি কিছুই তো ইহার হয় না। যদি বা কোন প্রকারে সূর্য নিষ্পীত হন, তাহা হইলে, আবার দীপ্ততর হইয়া উঠেন কীরূপে? (জীর্ণ হওয়াই তো সম্ভব।) অতএব তেজোরাশি সূর্য রাহুর মুখে প্রবিষ্ট হন না; কিন্তু, স্বয়ম্ভু, সর্ব্ব-দেবগণের ভক্ষণার্থ চন্দ্রসৃষ্টি করিয়াছেন, চন্দ্রের অমৃত সূর্য-তেজ হইতেই সম্ভূত। দেবগণ জলময় অমৃত পান করেন, পিতৃগণ স্বধামৃত পান করেন। তিনশত তেত্রিশ এবং তিন সহস্র তিন দেবতা সোমপায়ী। স্বয়ম্ভু, রাহুরও অমৃতভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য রাহু পর্বে পর্বে আসিয়া তাহা পান করিতে ইচ্ছা করে। তমোময় রাহু, পৃথিবীচ্ছায়া গ্রহণ করিয়া অমৃতপানেচ্ছায় তদ্দ্বারা চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করে। শুক্লপক্ষে চন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হয়, আর অমাবস্যায় সূর্যমণ্ডলে উপস্থিত হয়। সূর্যমণ্ডলেও উপস্থিত হয় চন্দ্রামৃতপানেরই উদ্দেশে। রাহু চন্দ্রের শরীর বিনষ্ট না করিয়া অমৃত-মাত্রই পান করে। ভ্রমর যেমন পদ্ম-বিনাশ না করিয়া তাহার মধু পান করে, সেইরূপ রাহু চন্দ্রের অমৃত পান করে।' (৪৯/১-১১)

অতএব, বুঝা গেল পৃথিবীর গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বদা চন্দ্র নির্ভরই হয় আর এটাই পূর্বে আধুনিক বিজ্ঞানের হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। রাহু তথা ছায়া দ্বারা চন্দ্রই গ্রস্ত হন। সমুদ্র মন্থনের সময় প্রাপ্ত অমৃতে সবার ভাগ ছিল না, এটা আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু অমৃত একেক জনের ক্ষেত্রে একেকরকম হয় আর সেটাও উপরে সুন্দর করে বর্ণিত হয়েছে তেমনি রাহুর অমৃত ভাগ হচ্ছে জ্যোতি বা আলো। সূর্য থেকে চন্দ্র যে জ্যোতি লাভ করে সেটাই গ্রহণের সময় রাহু কর্তৃক গ্রস্ত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সনাতন জ্যোতির্বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বর্ণিত হলো। এবার সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণে যেসব নিয়ম কানুন শাস্ত্রে নির্দেশিত আছে সেসবের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করা যাক!

মৎস্য পুরাণের ৬৭ অধ্যায়ে করণীয় কার্যের বিস্তারিত বর্ণনা আছে - বিভিন্ন রোগ, পীড়া নাশ ও জগৎ কল্যাণের কামনায় প্রার্থনা করা হয়েছে; যজ্ঞাদি কর্মের বিষয়েও বর্ণনা রয়েছে।

নিয়মগুলো মূলত ব্রত পালনের ন্যায়। গ্রহণ চলাকালীন সময়টাকে শিবরাত্রি, একাদশী ইত্যাদি অন্যান্য ব্রতের ন্যায় পালন করার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। গ্রহণ মানেই যে অশুভ সময় তাই নিয়ম কানুন মান্য করতে হয় এমন কিন্তু নয়। প্রমাণ দেখে নিন স্মৃতি থেকে -

কূপস্থান্যপি সোমার্কগ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ।
অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো বা অপাত্রং পাত্রমেব বা।।
বিপ্রব্রুবো বা বিপ্রো বা গ্রহণে দানমর্হতি।

সর্বং ভূমিসমং দানং সর্বো ব্রহ্মসমো দ্বিজঃ।।
সর্বং গঙ্গাসমং তোয়ং গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
প্রাতরাচমনং কৃত্বা শৌচং কৃত্বা যথাবিধি।।
দন্তশৌচং ততঃ কৃত্বা প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ।
দ্বৌ হস্তৌ যুগ্মতঃ কৃত্বা পূরয়েদুদকাঞ্জলিম্॥
(বাধুল স্মৃতি - ৫২-৫৫)

অনুবাদ: চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণকালে পৃথিবীতে সমস্ত জল (কূপস্থ জল ও) গঙ্গাজলের তুল্য হয়, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। গ্রহণকালে শ্রোত্রিয় বা অশ্রোত্রিয়, পাত্র অথবা অপাত্র, বিপ্র বা বিপ্রব্রুব (নিন্দ্য-ব্রাহ্মণ) সকলকেই দান করা যাইতে পারে। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণকালে সমস্ত দান ভূমিদানের তুল্য হয় এবং সকল দ্বিজই ব্রহ্মতুল্য হইয়া থাকেন এবং সমস্ত জল গঙ্গাজলসদৃশ হয়। প্রাতঃকালে মল-মূত্র ত্যাগের পর যথাবিধি শৌচ করিয়া আচমনপূর্বক দন্তশৌচ করত তৎপরে প্রাতঃস্নান করিবে। দুই হস্ত যুগ্মভাবে অঞ্জলি করিয়া জল দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবে।

এছাড়াও বৃহৎ পরাশর স্মৃতি ১০/৩৫০ অনুযায়ী - 'চন্দ্র বা সূর্য মহাগ্রহ রাহু কর্তৃক দৃষ্ট হইলে (অর্থাৎ গ্রহণকালে) সর্বপ্রকার দান অক্ষয়ফলপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, বিশেষতঃ সেই দান সূর্যগ্রহণে অধিক ফলদায়ক।'

পাঠকগণ স্বয়ং বিচার করুন কি করে গ্রহণকাল অশুভ হতে পারে? গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম মান্য করার বিষয়ে আমি কোথাও পাই নি। সবাইকে একই ধরনের নিয়ম কানুন মান্য করার বিষয়েই দেখা যায়। কূর্ম পুরাণ উত্তর ভাগ, ঊনবিংশ অধ্যায়, বিষ্ণু সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থে গ্রহণের কিছু পূর্বের নির্দিষ্ট সময় থেকে গ্রহণ চলাকালীন সময় ভোজনে নিষেধ করা হয়েছে। কি কি শুভ কর্ম করা কর্তব্য সেটা উপরেই দেখিয়েছি, সেসব কর্মের পাশাপাশি জপ ধ্যান ইত্যাদি করার বিধানও পাওয়া যায়। অতএব, উপরের সকল প্রমাণকে ভিত্তি মেনে আমার মতে গ্রহণকাল হচ্ছে একটি ব্রত। অন্যান্য ব্রতের যেমন নিয়ম কানুন থাকে এক্ষেত্রেও সেরকম। ভোজন গ্রহণ, সূচ বা ধারালো বস্তু ব্যবহারে নিষেধ এবং জপ, ধ্যান, যজ্ঞ, জগতের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা, পূর্ব পুরুষদের প্রতি তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দান ইত্যাদি শুভ কর্ম করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে শাস্ত্রে। একাদশীর ক্ষেত্রে যেমন পারণ না করলে ব্রত সম্পূর্ণ হয় না তেমনি গ্রহণের ক্ষেত্রেও শুধু নিষেধ মানলেই হবে না জপ, ধ্যান, দান ইত্যাদি কর্মও আবশ্যক। স্মৃতি চিন্তামণি গ্রন্থ অনুযায়ী চন্দ্র গ্রহণ এর ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট রাশির ব্যক্তি চন্দ্র গ্রহণ দর্শন করতে পারেন না। এটা সম্ভবত ফলিত জ্যোতিষ দ্বারা নির্ধারিত, আমি ফলিত জ্যোতিষকে শতভাগ সঠিক মনে করি না। তাছাড়া ফলিত জ্যোতিষ অনুযায়ী অনেকের ক্ষেত্রে চন্দ্র গ্রহণ দর্শন শুভ। তবে সূর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলো সরাসরি ও অধিক পরিমাণে আসে বিধায় বৈজ্ঞানিক ভাবেও সূর্য গ্রহণ দর্শন ক্ষতিকর।

আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রচলিত বিশ্বাসের মিল না পেয়ে অনেকের মনেই সনাতন ধর্মে বর্ণিত গ্রহণ বিষয়ক ভ্রান্তি ধারণার উদয় হয়েছে এমনকি কিছু কুসংস্কারও চলমান রয়েছে। এই প্রবন্ধের দ্বারা সেসব অপপ্রচার, কুসংস্কার ও সংশয় দূরীভূত হবে বলেই আশা করছি। গ্রহণ বিষয়ক আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সামঞ্জস্য দেখিয়ে প্রবন্ধটি এখানেই সমাপ্ত করছি।

জয় সনাতন🙏

তথ্যসূত্র:

১) আর্যভটিয়া (ইংরেজি) - ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইন্স একাডেমি, নয়াদিল্লি
২) লিঙ্গ পুরাণ - পঞ্চানন তর্করত্ন (বাংলা অনুবাদ), গীতাপ্রেস (হিন্দি)
৩) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ - পঞ্চানন তর্করত্ন
৪) দেবী পুরাণ - পঞ্চানন তর্করত্ন
৫) কূর্ম পুরাণ - পঞ্চানন তর্করত্ন
৬) মৎস্য পুরাণ - পঞ্চানন তর্করত্ন
৭) বাধুল স্মৃতি - ভূতেশচন্দ্র তর্ক স্মৃতিতীর্থ
৮) বৃহৎ পরাশর স্মৃতি - হরকান্ত স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ
৯) স্মৃতি চিন্তামণি - হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ
১০) উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন আন্তর্জাল সূত্র



শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা ও ঢাকী শ্রী গিরিধারী মহাশয়ের অভিজ্ঞতা

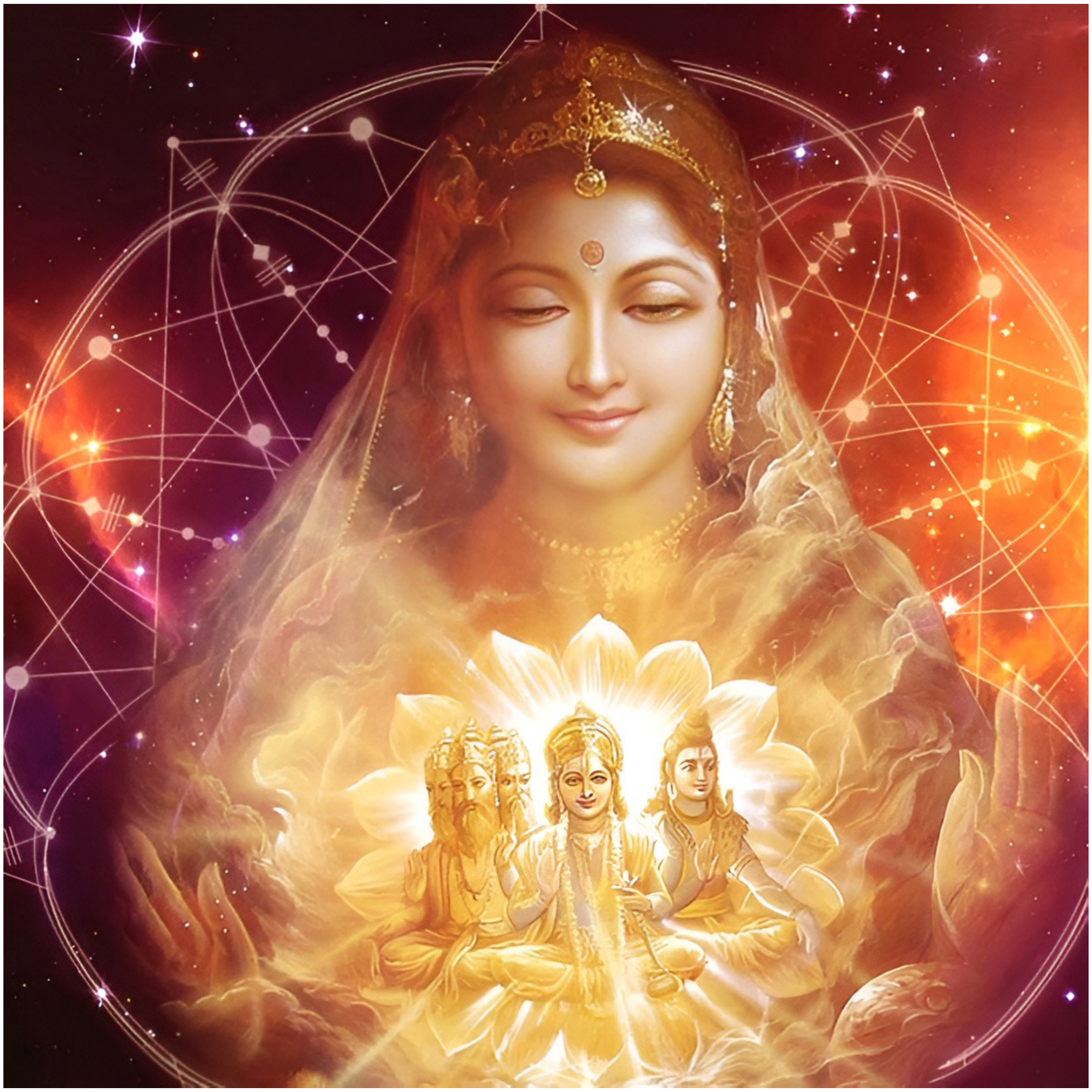
ডা. শৈবাল বসাক

অনেক বছর আগে যখন বিক্রমপুর নিবাসী গিরিধারী মহাশয় এপার বাংলা ও ওপার বাংলা উভয় জায়গাতেই দুর্গাপূজায় ঢাক বাজাতে যেতেন। একবার এপার বাংলায় এক সম্ভ্রান্ত বাড়িতে ঢাক বাজাতে তাকে নেয়া হলো। বাড়ির কর্তা পূজোর নিয়মকানুন সম্পর্কে তেমন কিছু একটা জানেন না। সেজন্য পূজাবিধি ঠিকভাবে অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব তিনি গিরিধারী বাবুর উপরই ন্যস্ত করলেন। দীর্ঘদিন দুর্গাপূজায় ঢাক বাজাবার কারণে গিরিধারী বাবুর পূজায় আচরণীয় বিধিমার্গের প্রায় সবটুকুই তার জানা।
এবাড়ির পূজাতে আগত পুরোহিত মহাশয়কে একটু আনাড়ি মনে হলো গিরিধারী বাবুর। দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, সাত্ত্বিকপুরাণ ইত্যাদি পুরাণের যেকোন একটি পুরাণ থেকে দুর্গাপূজা পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় কিন্তু এই পুরোহিতের পূজাপদ্ধতি যেন কোন পুরাণের সাথেই মিলছে না! পঞ্চমী-ষষ্ঠী তিথিতে দেবীকে আবাহন করে প্রথমে বেলতলায় রাখা হয়। সেখান থেকে দেবীকে আবাহনের মন্ত্রোচ্চারণ এবং বাদ্য বাজিয়ে মূল মণ্ডপে নেয়া হয়। পঞ্চমী-ষষ্ঠী তিথিতে বেলতলায় অবস্থান করা দেবীকে মূল মণ্ডপে নেয়ার আগে হঠাৎ করে বড়কর্তা গিরিধারী বাবুকেই বাজারে পাঠালেন পূজার কিছু সওদা আনতে! গিরিধারী বাবু তার ছেলেকে আবাহনের নির্দিষ্ট তালের বাদ্যের কথা বুঝিয়ে দিয়ে বাজারে গেলেন। বাজার থেকে এসে দেখলেন মূল মণ্ডপে দেবীর পূজা শুরু হয়েছে। কিন্তু ছেলে জানালো যে, পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করে দেবীকে বেলতলা থেকে মূল মণ্ডপে নেননি, তাই তাকে আর আবাহনের নির্দিষ্ট তালে ঢাকও বাজাতে হয়নি। একথা গিরিধারী বাবু পুরোহিতকে বললে তিনি তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "ঢাকী আছিস, ঢাকীই থাক।...আমায় পূজা করা শেখাতে আসিস নে।..." গিরিধারী বাবু তা বাড়ির কর্তাকে জানালেন না, মৌন রইলেন। একজন সামান্য ঢাকীর অনুযোগে বড়কর্তার সাথে পুরোহিতের বচসা হবার কোন ইচ্ছাই তার মনে আর জাগলো না। তাছাড়া বড়কর্তা নিজেই তো পূজাবিধি সম্পর্কে অজ্ঞ।
পরেরদিন সপ্তমী তিথিতে ঘুম থেকে উঠে গিরিধারী বাবু দেখলেন যে, তার ঢাকের এক প্রান্তের চামড়া ঢাকের পুরো ব্যাস বরাবর কাটা! একী সর্বনাশ! ঢাকটাকে এভাবে কে কাটলো!? যেন ধারালো তলোয়ার দিয়ে এক টানে কাটা! বাড়ির সবচেয়ে দুষ্ট ছেলেটাও ঢাকটাকে এভাবে কাটতে পারবে না। আর সে সুযোগও নেই। কারণ তিনি রাতে ঢাকটাকে অক্ষত দেখেছিলেন এবং রাতে দরজা বন্ধ করেই ঘুমিয়েছিলেন। গিরিধারী বাবু তৎক্ষণাৎ ছেলেকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে আরেকটা ঢাক আনালেন এবং কাটা ঢাকটাকে মেরামত করতে দিলেন। সপ্তমী পূজা সমাপ্ত হলো। অষ্টমী তিথির দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন যে, বাড়ি থেকে আনা দ্বিতীয় ঢাকটার এক প্রান্তের চামড়াও পুরো ব্যাস বরাবর কাটা!গিরিধারী বাবু মহাবিস্মিত হলেন। গিরিধারী বাবু আবার আরেকটা ঢাক আনালেন। নবমী ও দশমী তিথিতেও একই ঘটনা ঘটলো। অর্থাৎ চারদিনে চারটা ঢাক কাটা পড়লো!
দশমী তিথিতে নারীরা দেবীকে সিঁদুর পড়াতে গেলে সে সময় বেখেয়ালে একজনের প্রদীপের আগুন প্রতিমার চুলে লেগে আগুন ধরে গেলো, দেবীর মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেলো! দশমী তিথিতে পূজা শেষান্তে দর্পণ (যেখানে পূজা শুরু হবার আগে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়) বিসর্জন দেয়ার সময়ে ঘটলো অত্যন্ত অবাক করার মতো ঘটনা। পূজা উপলক্ষ্যে সে বাড়িতে বেড়াতে আসা এক কুমারী শিশু অদ্ভুত আচরণ শুরু করলো! সে বারবার চিৎকার করে বলতে লাগলো, "আমি গেলাম না, আমি গেলাম না।" বাড়ির কর্তা গিরিধারী বাবুকে ডাকলেন। গিরিধারী বাবু সে মেয়েশিশুর কাছে গেলেন। সে মেয়েকে গিরিধারী বাবু চেনেনও না আর সে মেয়েও তাকে চেনে না।
গিরিধারী বাবু কাছে গেলে মেয়েটি গিরিধারী বাবুকে বললো, "গিরিধারী, আমাকে বেলতলা থেকে মূল মণ্ডপে না এনেই চারদিন পূজা করলি, আবার আজ আমাকে বিদায়ও দিয়ে দিলি! আমি তো এই চারদিন বেলতলাতেই পড়ে রইলাম! কোন পূজাই তো পেলাম না! তোর ছেলে যে তোকে জানালো, আমাকে বেলতলা থেকে আবাহনের তালে (দেবীকে স্বাগতম তাল) বাদ্য বাজিয়ে ও মন্ত্রোচ্চারণ করে মূল মণ্ডপে নেয়া হয়নি, তুই সেটা বাড়ির কর্তাকে কেন বললি না!? তোর চারটা ঢাক যে চারদিনে কাটলাম, সেটা দেখেও তোর মনে কোন প্রশ্ন ওঠেনি? আমি গেলাম না!" গিরিধারী বাবুর ভাষ্যমতে মেয়েটির মুখমণ্ডলের যে ক্রোধরূপ, তা যেন রণাঙ্গণে অসুরের বিরুদ্ধে দেবী দূর্গার যুদ্ধকালে তাঁর মহাক্রোধান্বিত চণ্ডীরূপ!
গিরিধারী বাবু এই কুমারী মেয়ের মধ্যে দেবী দূর্গার এই অগ্নিরূপ দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সে মেয়ের



চরণে পতিত হয়ে বললেন, "মা, ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা। ভুল হয়ে গিয়েছে, বুঝতে পারিনি, তুমি এতটা ক্রোধিত হবে।... ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা। আরেকবার সুযোগ দাও, এখন কী করতে হবে বলো মা।..." তখন সে কুমারী কন্যা রূপী দেবী দুর্গা বললেন, "(একটা বাড়ির নাম উল্লেখ করে) এই এলাকায় ঐ বাড়িতে অমুক ব্রাহ্মণ আছেন। তাকে এনে আমাকে বেলতলা থেকে মূল মণ্ডপে এনে এই দর্পণকে চারদিন সংক্ষেপে পূজা করে তারপর বিসর্জন দে। নইলে কিন্তু আমি যাবো না...।" কুমারী রূপী দেবীর নির্দেশমতো তা করা হলো। পূজা শেষে দর্পণ বিসর্জন দেবার সাথে সাথেই কুমারী মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গেলো। জ্ঞান ফেরার পর তার আর এসবের কিছুই মনে ছিল না। কয়েক বছর হলো গিরিধারী মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কিন্তু দুর্গাপূজা এলে তাকে বেশি মনে পড়ে কারণ তিনি আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজায় ঢাক বাজাতে এসে বিভিন্ন পূজায় তার অভিজ্ঞতালব্ধ লোমহর্ষক সত্য ঘটনাগুলো বলতেন।

দেবী দুর্গার পূজা হচ্ছে রাজসিক পূজা। আর বড় বড় রাজাদের পক্ষেও দেবীপূজা শতভাগ বিধি মেনে করা সম্ভব নয়, আমাদের মতো ক্ষুদ্র প্রজা তো কোন ছাড়! একমাত্র ত্রিদেবের পক্ষেই তা সম্ভব। সুতরাং পূজোতে অনেক ভুলত্রুটি আমাদের হরহামেশাই হয়। তাই দেবীর কাছে আমাদের মিনতি ; হে দেবী, আমাদের মতো ক্ষুদ্র ভক্তদের পক্ষে তোমায় বিধিমার্গে পূজা করা অসম্ভব। আমাদের শুধু তোমার প্রতি সামান্য ভালোবাসা, ভক্তিটুকুই অবশিষ্ট আছে। তুমি সেই সামান্য ভক্তিটুকুর দিকেই দৃষ্টি দিয়ো, বিধিমার্গের দিকে নয়। হে মাতা, আমাদের ভালোবাসাটকুই গ্রহণ করো, ভুলটুকু উপেক্ষা করো, অসীম কৃপায় ক্ষমাও করো।



শাস্ত্র ও ঐতিহ্যের আলোকধারায় 'দুর্গতিনাশিনী দুর্গা'

উচ্ছ্বাস তালুকদার

বাঙ্গালী জাতির প্রধান প্রধান উৎসবগুলোর মধ্যে দুর্গা পূজা অন্যতম। তবে সেই পূজা যে শুধু প্রচলিত শাস্ত্র তথা পুরাণ নির্ভর তাই কিন্তু নয়। বাঙ্গালীর দুর্গা লোককথা, সাহিত্য-ইতিহাস, মঙ্গল কাব্য বা সমপর্যায়ের গ্রন্থ নির্ভরও বটে; এমনকি বেদ তথা বৈদিক সাহিত্য নির্ভরও বলা যায়। শরৎকালে বাঙ্গালীরা যে দুর্গা পূজা করে থাকে সেটাকে অকালবোধন বা অসময়ের পূজা বলা হয়, ওই সময় ভারতের বেশিরভাগ স্থানে নবরাত্রি উদযাপন হয়। নবরাত্রি মানে নয়দিনে দেবীর নয় রূপের পূজা। সনাতনীদের কাছে অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ ৫১ টি শক্তিপীঠ রয়েছে, ৫১ টি শক্তিপীঠে ৫১ টি আলাদা আলাদা রূপ, এছাড়াও বহু রূপ রয়েছে দেবীর। শাক্ত মতবাদে শক্তিই সবকিছুর মূল তথা ব্রহ্ম। অদ্বৈতবাদ দর্শনে ঈশ্বরের পাঁচটি সত্তাকে সমপর্যায়ের মনে করেই পূজা করা হয়, সেখানে শক্তিও আছেন। ভারতবর্ষে শক্তি আদি প্রকৃতি রূপে বহু পূর্ব থেকেই পূজিত হচ্ছেন। শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমা যে অত্যন্ত প্রাচীন সেটা ইতিহাসবিদগণও স্বীকার করেছেন। জন মার্শাল বলেছেন - 'মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা এবং বেলুচিস্তানে প্রাপ্ত প্রতিমাগুলি মহান মাতৃদেবীর অথবা তাঁর কোনো না কোনো স্থানীয় রূপের প্রতীক বলে ধরা যায়। কেননা পৃথিবীর আর কোনো দেশে মাতৃদেবীর উপাসনা এত প্রাচীনকাল থেকে এত গভীরভাবে গেঁথে বসেনি এবং সর্বব্যাপী হয়ে ওঠেনি, যেমনটা ভারতে হয়েছে। এই ভূমির সর্বত্র—গ্রাম থেকে নগর, প্রান্ত থেকে রাজধানী—মাতৃদেবীর মন্দির ও

পূজাস্থল পাওয়া যায়। তিনি হচ্ছেন "মাতা" বা "মহান মাতা", প্রকৃতির (প্রকৃতি) সেই আদিরূপ, যিনি পরবর্তীকালে শক্তি-স্বরূপে বিকশিত হয়েছেন।'

ইতিহাসবিদদের মতে বেদ লিখিত হয়েছিল ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বে, মহেঞ্জোদাড়ো নগরী ২৬০০ খ্রীষ্টপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিন্ধু সভ্যতা ৩৩০০ (মতান্তরে ৩৫০০) খ্রীষ্টপূর্ব থেকে শুরু হয়। ইতিহাসবিদগণ মনে করেন যখন বেদ লিখিত হয়েছে তখনই মূলত বেদের সময়। তাহলে দাঁড়াচ্ছে তাঁদের হিসেবে বেদের সময়ের থেকেও শক্তির বিভিন্ন রূপের পূজার সময়কাল প্রাচীন। বঙ্গেও একসময় শাক্ত শৈবদের প্রভাব খুবই গভীরভাবেই লক্ষ্য করা যায়। অনেক পণ্ডিতের মতে 'দুর্গা' বৈদিক দেবীও বটে, ইতিহাসবিদগণ বেদের বিভিন্ন অংশের ক্ষেত্রে যেসব ভাষ্য ব্যবহার করেছেন সেগুলো অনুযায়ী অন্তত দুর্গা বেদেই আছেন। বেদের আবার ১১৩১ টি শাখা, যার মধ্যে অধিকাংশই বিলুপ্ত। মহর্ষি পতঞ্জলির ব্যাকরণ মহাভাষ্যে আছে - **'একশতমধ্বর্য়ুশাখেঃ, সহস্রবর্ত্মা সামেবেদঃ, একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যম্, নবধাথের্বণোবেদঃ'** (মহাভাষ্য, পস্পাহ্নিক)

অর্থাৎ - যজুর্বেদের একশত এক শাখা, সামবেদ সহস্রশাখাযুক্ত, ঋগ্বেদ একবিংশতি শাখাবিশিষ্ট, অথর্ববেদ নয় শাখায় বিভক্ত (১০১+১০০০+২১+৯ = ১১৩১)।

বর্তমানে বেদের সকল শাখা পাওয়া না গেলেও কিছু শাখা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে, আশ্বলায়ন শাখার সংহিতা ভাগ পাওয়া যায়; এই শাখায় শাকল শাখার সংহিতা ভাগের মত মন্ত্র থাকলেও বাড়তি কিছু মন্ত্র পাওয়া যায়। অনেকে বলেন এই শাখাতেই সবচেয়ে বেশি মন্ত্র পাওয়া যায়, যদিও শাকল শাখার সংহিতা ভাগই অধিক জনপ্রিয় এবং ঋগ্বেদ বললে অধিকাংশ লোক এই শাখার সংহিতা ভাগকেই বুঝে থাকে। আশ্বলায়ন শাখায় রয়েছে -

আদিত্যবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনিং চন্দ্রসহস্রদীপ্তিম্।
দেবিং কুমারীমৃষিপূজিতাম্ তাম্ তাম্ দুর্গস্মাতোং শরণং পদ্যে॥

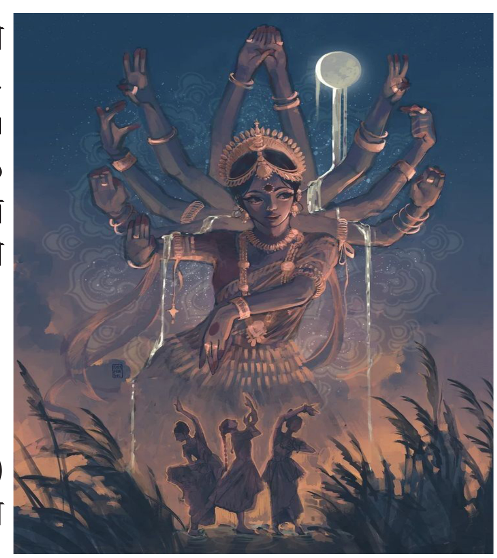
(ঋগ্বেদ সংহিতা - আশ্বলায়ন শাখা -১০/১২৮/৭)

সরলার্থ:- যাঁর বর্ণ আদিত্যের ন্যায়, যিনি তপস্যার দ্বারা প্রজ্বলিত, যিনি সূর্যের মতো বিচিত্র আলোর অধিকারী, যাঁর সহস্র চন্দ্রের তেজ, যিনি সর্বদা কুমারী থাকেন এবং যিনি ঋষিদের দ্বারা পূজিত হন, আমি সেই দুর্গা দেবীর আশ্রয় নিলাম। হে মাতা! আমায় পরিত্রাণ করুন, আপনাকে প্রণাম।

তবে অনেকের আবার এই শাখার মান্যতা নিয়ে আপত্তি আছে। ঋগ্বেদ শাকল শাখায় (সব শাখাতেই আছে) দেবী সূক্ত ও রাত্রি সূক্ত রয়েছে যা শ্রী শ্রী চণ্ডীর সকল অনুবাদক ও ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকারগণ বইয়ের শুরুতেই যুক্ত করেছেন। সংস্কৃত অভিধান অমরকোষে রয়েছে -

উমা কাত্যায়নী গৌরী কালী হৈমবতীশ্বরা।
শিবা ভবানী রুদ্রাণী সর্ব্বাণী সর্বমঙ্গলা।
অপর্ণা পার্বতী দুর্গা মৃড়ানী চণ্ডিকাম্বিকা।।

অনুবাদ : উমা, কাত্যায়নী, গৌরী, কালী, হৈমবতী, ঈশ্বরা, শিবা, ভবানী, রুদ্রাণী, সর্বাণী,সর্বমঙ্গলা, অপর্ণা, পার্বতী, দুর্গা, মৃড়ানী, চণ্ডিকা, অম্বিকা - উমা শব্দ হতে অম্বিকা শব্দে দুর্গাকে বুঝায়। (অমরকোষ - ১ম কাণ্ড, স্বর্গ বর্গ, ২৮)



পদ্ম পুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড, অধ্যায় ৪৩ এ উমা তথা আমাদের পরিচিত মা দুর্গাকে **রাত্রি/বিভাবরি** হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। **'ব্রহ্মোবাচ। বিভাবরি মহৎকার্য্যং দেবানাং সমুপস্থিতম্...'** (খণ্ডাংশ, ৫৫ নং শ্লোক)। **'...উমায়াত্ত্বং ভবিষ্যসি'** (খণ্ডাংশ, ৭১ নং শ্লোক)। এছাড়াও নিরুক্ত ১১ নং অধ্যায়ে গৌরী শব্দ পাওয়া যায়। নিরুক্ত ১১/৪০ এ ঋগ্বেদের তথ্যসূত্র ব্যবহার করে গৌরীকে মাধ্যমিকা বাক্ বলা হয়েছে। শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে রয়েছে -

এষৈব দুর্গা ভূত্বর্চং কৃত্বা স্যাৎসুক্তভাগিনী।
তন্নামানি যমীন্দ্রাণী সরমা রোমশোর্বশী।
ভবত্যগ্র্যা সিনীবালী রাকা চানুমতিঃ কুহূঃ।।

(বৃহদ্দেবতা - ২/৭৭)

অনুবাদ: দুর্গা রূপে এবং একটি ঋকের উচ্চারণ করে ইনি সম্পূর্ণ সূক্তের

ভাগিনী হয়েছেন। এর (অন্য) নাম যমী, ইন্দ্রাণী, সরমা, রোমশা, উর্বশী; ইনি সর্বপ্রথম সিনীবালী ও রাকা, অনুমতি তথা কুহু হয়েছেন। (এখানে মূলত বাক্ দেবীর অন্য নাম বুঝানো হচ্ছে)
এছাড়া পাদটীকায় রোমশা ও দুর্গা ব্যতীত অন্য নামগুলো নিরুক্তের নিঘণ্টুকাণ্ড ৫.৫ এ রয়েছে এমনও উল্লেখ রয়েছে। এই অংশে গৌরী শব্দও রয়েছে। অর্থাৎ, গৌরী যে বাক্ দেবীর অন্য নাম ও দুর্গাই যে গৌরী সেটা প্রমাণ হলো। তাছাড়া পুরাণেও 'রাত্রি' বলে সম্বোধন করার প্রমাণ দেখানো হয়েছে। শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা ২/৮৬ অনুযায়ী - কোনো কোনো সূক্তের যিনি ঋষি তিনিই দেবতা। এই অংশের পাদটীকায় এমন সূক্তের উদাহরণ দিতে গিয়ে দেবী সূক্ত (ঋ. স. ১০.১২৫) ও রাত্রী সূক্ত (ঋ. স. ১০.১২৭) এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে (বর্তমানে প্রাপ্ত সকল শাখার সংহিতা ভাগের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র একই পেয়েছি)। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রয়েছে -

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।।
(১০ম প্রপাঠক, ২য় অনুবাক)



অনুবাদ: আমি সেই দেবী দুর্গার শরণ গ্রহণ করি — যাঁর বর্ণ অগ্নির মতো দীপ্ত, যিনি তপস্যার তেজে জ্বলন্ত, যিনি বৈরোচন (সূর্য) তুল্য আলোকময়, যিনি সকল কর্মফলের মধ্যে অধিষ্ঠিত। হে দ্রুতগামিনী, হে দুর্গা! তোমাকে নমস্কার, তুমি সহজেই সকল বাঁধা পার করাও।
এছাড়াও কৃষ্ণ যজুর্বেদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক - ১০/২/৭ এবং এই আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত যাজ্ঞিকী বা মহানারায়ণ উপনিষদ - ১/৩৪ এ দুর্গা গায়ত্রী পাওয়া যায় -

কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারি ধীমহি।
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।।

বঙ্গে বর্তমান পদ্ধতি ও প্রতিমায় দুর্গা পূজা প্রচলনেরও অনেক ইতিহাস রয়েছে। মল্ল রাজাদের এক পটচিত্রে অন্যান্য দেব দেবী (পরিবার) সহ দুর্গা পূজা হাজার বছরের পুরাতন। এই পূজাটি কৃষ্ণ নবমী থেকেই কল্পারম্ভ হয়ে শুক্ল পক্ষের দশমী পর্যন্ত চলমান থাকে। কৃত্তিবাস ওঝা (আনু. ১৩৮১ - ১৪৬১ খ্রি.) পদ্যানুবাদে রামায়ণ লিখেন। এতে বাল্মীকি রামায়ণের বাহিরেও কিছু বিষয় রয়েছে তন্মধ্যে রাম কৃত অকালে দুর্গা পূজা (শুক্ল-ষষ্ঠী কল্প) নিয়েও

আছে (অকালবোধন)। অনেকে মনে করেন একারণেই শুধু শরৎকালীন দুর্গা পূজা হয়, ইহা শাস্ত্রীয় নয়। এমনকি কৃত্তিবাস কৃত রামের দুর্গা পূজা শুধু কবির স্বকল্পিত, শাস্ত্র সম্মত নয়। শ্রী শ্রী চণ্ডী - ১২/১২ এ শরৎকালীন পূজার বিষয়ে রয়েছে - '**শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী...।**' দেবী ভাগবত মহাপুরাণ এ (৩য় স্কন্ধ, ৩০ অধ্যায়) রাম কৃত দুর্গা পূজা ও মহাভাগবত (উপ) পুরাণে (৪৩ ও ৪৫ অধ্যায়) অকালবোধনের বিষয়টি রয়েছে। তাই কৃত্তিবাস ওঝাকে না মানলেও শরৎকালীন পূজা ও রাম কৃত দুর্গা পূজা যে শাস্ত্র সম্মত সেটা স্বীকৃত হয়।
১৬শ শতাব্দীর গৌড়েশ্বর মহারাজ কংসনারায়ণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন। পন্ডিতেরা বললেন, কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্ভব নয়। মার্কন্ডেয় পুরাণে যে দুর্গার কথা আছে তার পূজা করুন। এভাবেই তিনি প্রথম দুর্গা পূজা আরম্ভ করেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১১৫/১০৯ অনুযায়ী কলিতে অশ্বমেধ নিষিদ্ধ। এছাড়া দেবী পূজা করলে অশ্বমেধের ন্যায়ই ফল লাভ হয়। দেবী পুরাণে আছে (৬২/৭) - '...**অশ্বমেধং পশুমেধং গোমেধং ক্রমশঃ ফলম্‌।**' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দুর্গা পূজাও অনেক পুরাতন, পরিবার সহ পূজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রচলন করেন বলে অনেকের মত। চালচিত্রের পূজাও এসময়েই জনপ্রিয় হয়।
অতএব, শক্তির বিভিন্ন রূপের উপাসনা অনেক পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল এবং ইতিহাসবিদদের মান্য গ্রন্থ অনুযায়ীই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তন্মধ্যে, দুর্গাপূজাও যে বেদের সময় থেকেই প্রচলিত সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
নমশ্চণ্ডিকায়ৈ🙏

তথ্যসূত্র:
১) Mohenjo Daro And The Indus Civilization - John Marshall
২) পতঞ্জলি প্রণীত ব্যাকরণ মহাভাষ্য (পস্পশাহ্নিক) - দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম
৩) Āśvalāyana Samhitā of The Rgveda - B.B. Chaubey
৪) শ্রী শ্রী চণ্ডী - পঞ্চানন তর্করত্ন
৫) শ্রী শ্রী চণ্ডী - স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
৬) অমরকোষ - পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য
৭) পদ্ম পুরাণ - নবভারত পাবলিশার্স
৮) শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা - সুশোভন সাঁতরা
৯) কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক (সংস্কৃত) - রাজেন্দ্রলাল মিত্র
১০) কৃষ্ণযজুর্বেদীয় মহানারায়ণ উপনিষদ - স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
১১) ঋগ্বেদে দুর্গা (প্রবন্ধ) - শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী এম এ (ভারতবর্ষ পত্রিকা, ৫১ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা)
১২) কৃত্তিবাসী রামায়ণ - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
১৩) দেবী ভাগবত পুরাণ - পঞ্চানন তর্করত্ন
১৪) মহাভাগবত পুরাণ - পঞ্চানন তর্করত্ন
১৫) ব্রহ্মবৈর্বত পুরাণ - নবভারত পাবলিশার্স
১৬) দেবী পুরাণ - পঞ্চানন তর্করত্ন
১৭) বিভিন্ন আন্তর্জাল সূত্র



দীপাবলি এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

স্নেহা গাইন
তথ্য সহযোগিতা :- মৃগাঙ্ক রায়

শরৎকাল মানেই হালকা শীতের আমেজ, মনোরম পরিবেশ আর বাঙালির মনে উৎসবের রেশ। সারাবছরের ক্লান্তি, দুঃখ কষ্টের অবসান, কারণ এই সময় মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গার অকালবোধন, সারা বছর সকলে মায়ের মুখ দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। দেবীর আরাধনায় উৎসবের পাঁচটা দিন আনন্দে কাটে কিন্তু বিজয়া দশমীতে মায়ের বিসর্জনের পর সকলের মন ভরে ওঠে বিষন্নতায়.. আবার গোটা একটা বছরের অপেক্ষা। ঠিক তখনই যেন মা, স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়া আমাদের কানে কানে এসে বলে যান তিনি আছেন, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, কালিকা রূপে আবার ফিরবেন ভক্তের কল্যাণে, দুষ্টের দমনে। এমন কোনো স্থান নেই যেখানে দেবী বিরাজমান নন, তিনিই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ, তিনিই জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনিই গ্রাস করেন।

কুত্র বা গচ্ছসে পাপে যত্র নাহং কুতোঽত্র তৎ।
কারণাননমধ্যস্থং মমেদং বক্ত্রগং জগৎ।।
(দেবীপুরাণ: ৮৬.১৬)

সরলার্থ :- এমন কোন স্থান আছে , যেখানে আমি বর্তমান নাই? এই ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ আমি, আমার মুখের মধ্যেই এই জগৎ বিদ্যমান রয়েছে।

এছাড়াও দেবী কালিকা সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে -

কালী দক্ষাপমানেন সর্বশত্রুনির্বর্হণী।
কলনা কালসংখ্যা বা কালী দেবেষু গীয়তে।।
কপালং ব্রহ্মকং জাতং করে ধারয়তে সদা।
কপালী তেন সা প্রোক্তা পালনাদ্বা কপালিনী।।
(দেবীপুরাণ:৩৭.১৫-১৬)

সরলার্থ :- দক্ষাপমানকালে দেবীর নাম কালী হয়েছে। কালে সমস্ত পদার্থেরই কলন বা সংহার করেন বলে দেবগণ তাঁকে কালী নামে অবিহিত করেন। তিনি সর্বদা হাতে ব্রহ্মকপাল ধারণ করেন কিংবা পালন করেন বলে তাঁর নাম কপালী ও কপালিনী।

কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে দেবী কালিকা পূজিত হন ধরাধামে। এই আরাধনার এই অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো দীপদান। প্রদীপ মালার মতো সাজিয়ে দেবীকে সমর্পণ করা হয়। দীপাবলির এই আলো সমস্ত কল্যাণের আধার। এই আলো সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য, সুস্বাস্থ্য, ধনসম্পদের প্রাচুর্যতা বয়ে আনে। এইজন্য এই কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে বেশি বেশি করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে ঘর এবং ঘরের চারিপাশে আলোকিত করে রাখতে হয়। দীপদানের এই বিষয়ে দেবীভাগবত পুরাণে উল্লেখিত আছে :-

তুলাস্থে দীপদানেন পূজা কার্য্যা মহাত্মনা।
দীপবৃক্ষাঃ প্রকর্তব্যা দীপচক্রাস্তথাপরা।।
দীপযাত্রা প্রকর্তব্যা চতুর্দ্দশ্যাং কুহূষু চ।
সিনীবালীস্তথা বৎস তদা কার্য্যং মহাফলম্।
সর্বশেষে প্রকর্তব্যা বলিপূজাহোমোৎসবম্।
নৈরাজনং প্রকর্তব্য নৃনাগেতুরগাদিষু।
কার্তিক্যাং কারয়েৎ পূজা যাগং দেবীপ্রিয়ং সদা।।

(দেবীপুরাণ: ৫৯ . ২৩-২৬)

সরলার্থ:- কার্ত্তিক মাসে দীপমালা দান করে পূজা করবে। ঐ মাসের চতুর্দশী এবং অমাবস্যার দিন দীপমালা, দীপচক্র ও দীপবৃক্ষাদি নির্মাণ করিবে। ঐ দিবস বলি-পূজা-হোম করা কর্তব্য। দেবতাদের অভ্যুত্থান ও মনুষ্য, অশ্ব, হস্তি প্রভৃতির নীরাজন করবে (যুদ্ধযাত্রার পূর্বে অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিষ্কারকরণ তথা অর্চনাকরণ)। কার্তিক মাসে দেবীর পূজা এবং দেবীর উদ্দেশ্য যজ্ঞ করবে। যজ্ঞ দেবীর অত্যন্ত প্রিয়।

তাই এই সময় ঘরে ঘরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে আলোয় আলোয় আলোকিত করে রাখা হয়।

দীপাবলির ঠিক দুইদিন পর অর্থাৎ কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা যমাদ্বিতীয়া নামে পরিচিত।

কার্তিকে শুক্লপক্ষস্য দ্বিতীয়ায়াং যুধিষ্ঠির।
যমো যমুনয়া পূর্বং ভোজিতঃ স্বগৃহে তদা ।।

(ভবিষ্যপুরাণ: উত্তরপর্ব, যমদ্বিতীয়াব্রত, ১১.১৮)

সরলার্থ :- হে যুধিষ্ঠির, কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে যমরাজ যমুনা ভগিনীর দ্বারা প্রথমে ভোজন করেছিলেন তাই এই তিথির নাম যমা।

বঙ্গভূমিতে ভাই বোনের এক স্নিগ্ধ, অপূর্ব সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, যা ভাইফোঁটা নামে পরিচিত।

অস্যাং নিজগৃহে পার্থন ভোক্তব্যমতো বুধৈঃ।
স্নেহেন ভগিনীহস্তাদ্ ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।।
(ভবিষ্যপুরাণ: উত্তরপর্ব, যমদ্বিতীয়াব্রত, ১১.২১)

সরলার্থ :- হে পার্থ, বুদ্ধিমান পুরুষ এই তিথিতে নিজ গৃহে ভোজন করেন না। স্নেহের সঙ্গে নিজ ভগিনীর হাতে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করেন।

এইদিনে সকল ভগিনী তার ভাইকে যত্ন সহকারে ভোজন করায় এবং তার ভাইয়ের সার্বিক মঙ্গলকামনা করে তার কপালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে দেয়। তার ভাইয়ের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সৌভাগ্য প্রার্থনা করে ভগবানের কাছে। এবং প্রত্যেক ভাই তার বোনকে বস্ত্রাদি, অলংকার দ্বারা আশীর্বাদ করে।



এছাড়াও ভগিনীকে শ্রদ্ধা, স্নেহ এবং ভালোবাসা জানাতে হয়। ভাইকে ফোঁটা দেওয়ার একটি লৌকিক ছড়া প্রচলিত রয়েছে।

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দেই আমার ভাইকে ফোঁটা।
যম যেমন চিরজীবী আমার ভাই যেন হয় তেমন চিরজীবী"

এই ছড়া পাঠ করে ভাইয়ের কপালে বোনেরা ফোঁটা দেওয়ার সময় যেমন সৌভাগ্য, দীর্ঘায়ু কামনা করে তেমনি প্রত্যেক ভাই দায়িত্ব নেয় তার বোনের সম্ভ্রম, সন্মান রক্ষার। প্রত্যেকটা ভাই যেন তার বোনের কাছে রক্ষাকবচ। বঙ্গভূমিতে যেমন এই উৎসব ভাইফোঁটা নামে পরিচিত তেমনি পশ্চিম ভারতে ভাইদুজ নামে পরিচিত। আবার মহারাষ্ট্র, গোয়া ও কর্নাটকে এই উৎসব ভাইবিজ নামে পরিচিত। নেপালে এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এবং আশেপাশের এলাকায় এই উৎসব ভাইটিকা নামে পরিচিত। এইভাবেই গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ভাই বোনের এই পবিত্র সম্পর্কের উদযাপন করা হয়।



যজ্ঞে পশুবলি

বৃহদ্রথ সান্যাল

বৈষ্ণব বিধি মানতে গিয়ে অনেকেই আজকাল শৈব ও শাক্তদের বিধিকে মান্য তো করেই না বরং ছোট করে। আর সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে পশুবলি নিয়ে। যারা ফেসবুকের মতো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে তাদের বেশিরভাগই বাস্তব জীবনে পেট ভরে মাছ মাংস খাচ্ছে। আর কিছু লোক আছে যারা নিজের মান্যতাকে বড় করতে গিয়ে অন্যের মান্যতাকে খাটো করছে। এতে নিজেদের মধ্যেই একতার পরিবর্তে দ্বন্দ্ব চলছে। এটার সমাধান অদ্বৈত চিন্তায় পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী পঞ্চমতের আরাধ্য অর্থাৎ - শিব, শক্তি, বিষ্ণু, গণেশ ও সূর্য একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি গুণযুক্ত রূপ। এই পাঁচজন মূলত একই ঈশ্বর, বিভিন্ন কল্পে এই পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ থেকে জগতের সবকিছু সৃষ্টি হয়। একারণেই অষ্টাদশ মহাপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন রূপকে সৃষ্টির কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে (যেমন - বিষ্ণু পুরাণে বিষ্ণু, শিব পুরাণে শিব ইত্যাদি; মূলত এগুলো একেক কল্পে একেক গুণযুক্ত রূপ থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে এমন বুঝায়)। অদ্বৈতবাদ যেমন পাঁচটি রূপকেই এক ঈশ্বরের প্রকাশ ও সর্বোচ্চ মান্য করে তেমনি পাঁচটি রূপের আলাদা আলাদা গুণ থাকায় পূজা ও উপাসনা পদ্ধতিও আলাদা ভাবেই মান্য করে (পূজা ও উপাসনা পদ্ধতি মূলত যাঁর আরাধনা করা হবে তাঁর সম্পর্কিত শাস্ত্র অনুযায়ীই পূজা করা হয়)। কালী পূজা, মনসা পূজা, দুর্গা পূজায় অষ্টমী নবমীর বলি ইত্যাদির সময়েই বেশিরভাগ পশুবলির বিরোধিতা শুরু হয়। শ্রী শ্রী চণ্ডীতে রয়েছে -

'হে দেবী, বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা আপনারই অংশ। চতুঃষষ্টি-কলাযুক্তা এবং পাতিব্রত্য, সৌন্দর্য ও তারুণ্যাদি গুণান্বিতা সকল নারীই আপনার বিগ্রহ। আপনি জননীরূপা এবং একাকিনীই এই জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। যখন আপনি স্বয়ং স্তবনীয় বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ উক্তিরূপা, তখন আপনার এইরূপ স্তুতি আর কি হইতে পারে?'

(শ্রী শ্রী চণ্ডী - ১১/৬)

এছাড়া আরও আছে -

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা।।

অনুবাদ : দেবী, যাঁহার দ্বারা সর্বশাস্ত্রের মর্ম অবগত হয়, সেই মেধা আপনি। আপনি দুস্তর সংসার-সমুদ্রের তরণী, অদ্বিতীয়া ব্রহ্মময়ী; আপনি নারায়ণের হৃদয়বিলাসিনী লক্ষ্মী এবং মহাদেবের গৌরী। (দেবী একাধারে ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী)

(শ্রী শ্রী চণ্ডী - ৪/১১)

অর্থাৎ সকল নারী ও দেবী রূপ মূলত মহামায়া তথা শক্তির অংশ। আর পশুবলির বিরোধিতাও বর্তমানে শক্তি পূজার ক্ষেত্রেই অধিক লক্ষিত হয়! কালী পূজা ও অনেক শক্তি পূজাই শাক্ত নিয়মে হয়ে থাকে তাই শাক্ত পুরাণ কালিকা পুরাণ থেকে পশুবলির প্রমাণ দেখে নিন -

বলিদানং ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্দেব্যাঃ প্রমোদকম্।
মোদকৈর্গজবক্ত্রঞ্চ হবিষা তোষয়েদ্ধরিম্॥
তৌর্যত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তোষয়েদ্ধরিম্।
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা॥

(কালিকা পুরাণ - অধ্যায় ৫৫, শ্লোক ১-২)

অনুবাদঃ ভগবান বলিলেন, তাহার পর দেবীর প্রমোদজনক বলি প্রদান করিবে। কেননা, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে সাধক, মোদক দ্বারা গণপতিকে, ঘৃতদ্বারা হরিকে, নিয়মিত গীত বাদ্যদ্বারা শঙ্করকে এবং বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে সর্বদা সন্তুষ্ট করিবে।

এখানে স্পষ্ট করেই বলা আছে যে, চণ্ডিকা তথা শক্তিকে (শক্তির উপাসকদের শাক্ত বলা হয়) বলিদানের মাধ্যমেই সন্তুষ্ট করতে হয়। বাকি চার রূপকে কিভাবে সন্তুষ্ট করতে হয় সেটিও উক্ত শ্লোকে বলা আছে। এখন কিছু লোকজন হয়তো আপত্তি করতেই পারেন, সনাতন ধর্মের মূল শিক্ষা তো নিষ্কাম কর্ম তাহলে কেনো সন্তুষ্ট করতে হবে? এটা বুঝার পূর্বে আপনাদের বুঝতে হবে শক্তি পূজায় বলিদান উপরের শ্লোকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অন্য রূপের ক্ষেত্রেও উল্লেখিত বিষয়গুলো বাধ্যতামূলক কার্য। এবার স্মৃতি প্রস্থান গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত শ্রীমদ্ভগবদগীতা থেকেই দেখে নেওয়া যাক কি বলা আছে -

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।।

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ৫/৬)

অনুবাদঃ হে মহাবাহো! কর্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দুঃখজনক। কিন্তু যোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মকে লাভ করে।

অর্থাৎ, বাধ্যতামূলক কর্মগুলো ত্যাগ করে যে সন্ন্যাস সেটা দুঃখজনক। তাই শক্তি পূজায় বলি বাধ্যতামূলক কর্ম হিসেবে দিতেই হবে। অনেকে পশুবলি দেন না তাদের জন্য ইক্ষু, কুমড়া ইত্যাদি বলি দিতেই হবে (দক্ষিণাচারে মঠগুলোতে পশুবলি দেওয়া হয় না তবে ইক্ষু ইত্যাদি বলি দিতে হয়)। তবে যারা পশুবলি দেন সেটা মোটেও ভুল নয় বরং শক্তি পূজায় পশু বলি প্রশস্ত হিসেবেই গণ্য হয়। এই বিষয়ে অনেক অনেক প্রমাণ আপনারা কালিকা পুরাণ, দেবী ভাগবত মহাপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ পড়লেই পেয়ে যাবেন। কিন্তু এই প্রবন্ধে শুধু পশুবলি সম্পর্কিত কিছু দ্বন্দ্বের নিরসন করা হবে; কারণ এগুলো নিয়ে সনাতনীদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে, ফলস্বরূপ একতা তো দূর - হিন্দু হিন্দুর শত্রুতুল্য হয়ে যায়। যজ্ঞের জন্যেই মূলত পশু সৃষ্টি হয়েছে - এটা শাস্ত্রের বিধান। দেখে নিন প্রমাণ -

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

(কালিকা পুরাণ - অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ৪১)

অনুবাদ:- স্বয়ম্ভু স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত পশু সকলের সৃজন করিয়াছেন, এই নিমিত্ত অদ্য তোমার বধ করি। কারণ যজ্ঞে বধ অবধের সমান।

মন্ত্রার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মের স্বয়ম্ভবা।
মজ্ঞোংস্য ভূইত্য সর্বস্য তস্মাদ যজ্ঞে বধোংবষঃ।।

(মনু সংহিতা - ৫/৩৯)

অনুবাদ: যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ যে পশুবধ তা সিদ্ধ করবার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজেই পশুসমূহ সৃষ্টি করেছেন। আর

যজ্ঞ এই সমগ্র জগতের ভূতি বা পুষ্টির সাধক। সেই কারণে যজ্ঞে যে পশুবধ তা বধই নয়, কারণ, এইরকম ক্ষেত্রে পশুবধে পাপ নেই।
আর যজ্ঞের সকল কর্মই অহিংস হিসেবে বেদে বর্ণিত আছে। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ ও বেদাঙ্গ নিরুক্ত থেকে এই বিষয়ের প্রমাণ দেখে নিন -
"তিনি 'অধ্বর' (পদ) যুক্ত এই তিনটি (নবম, দশম ও একাদশ) ঋক্‌কে উচ্চারণ করেন। দেবগণ যখন যজ্ঞের দ্বারা যাগ করিতেছিলেন, তখন শত্রু অসুরগণ তাঁহাদিগকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা হিংসা করিতে ইচ্ছা করিলেও হিংসা করিতে পারে নাই, প্রত্যুত পরাভুতই হইয়াছিল; এই জন্যই যজ্ঞের নাম অধ্বর (অর্থাৎ হিংসারহিত)। যিনি ইহা এইরূপ জানেন, এবং যাহার জন্য তাঁহারা (ঋত্বিকগণ) অধ্বর (শব্দ) যুক্ত ঋক্ ত্রয় উচ্চারণ



করেন, তাঁহার হিংসা-ইচ্ছাকারী শত্রু পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সোম যাগ ('সৌম্য অধ্বর') দ্বারা লোকে যাহা জয় (অর্থাৎ লাভ) করিয়া থাকে, তিনি (যজমান, দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের দ্বারাও) তাহা জয় করিতে পারেন।"
(শুক্ল যজুর্বেদ - শতপথ ব্রাহ্মণ - ১/৪/১/৪০)
অধ্বর ইতি যজ্ঞনাম ধ্বরতির্হিংসা কর্মা তৎপ্রতিষেধো ।
অনুবাদ : যজ্ঞের ওপর নাম অধ্বর। ধ্বর অর্থ হিংসাকর্ম, যজ্ঞ হিংসাভাবসম্পন্ন কিন্তু হিংসাত্মক নয়।
(অমরেশ্বর ঠাকুর কৃত যাস্কাচার্যের নিরুক্ত - ১ম অধ্যায়/২য় পাদ/৪র্থ পরিচ্ছেদ/১৫ নং শ্লোক)

বেদ ও বেদাঙ্গ সমর্থনে মনুসংহিতার ব্যাখ্যা -
যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্ বেদাদ ধর্মো হি নির্বভৌ।। ৪৪
(মনুসংহিতা - ৫/৪৪)
অনুবাদ: এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতে বেদবিহিত যে পশুহিংসা নিয়ত আছে অর্থাৎ অনাদি কাল থেকে চলে আসছে, তাকে অহিংসা বলেই জানতে হবে, কারণ, বেদে এরকম বলা হয়েছে; বেদ থেকেই ধর্মের প্রকাশ হয় [অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্মের যে কথা তা একমাত্র বেদ থেকেই নিরুপিত হয়। আর সেই বেদই জানাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে পশুহিংসা অভ্যুদয়ের কারণ হয়।]
এবার পরবর্তী শঙ্কার সমাধান করা যাক! অনেকেই প্রশ্ন করেন, কেনো পশুবলি দেওয়া হয়? এতে লাভ কী হয়?

এটার সহজ উত্তর হচ্ছে, যজ্ঞের নিমিত্তে যেসব পশুকে বধ করা হয় তারা সরাসরি উচ্চ যোনি লাভ করে। প্রমাণ দেখে নিন শাস্ত্র থেকে -
ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্তবয্যজ্জিতীঃ পুনঃ।।
(মনুসংহিতা - ৫/৪০)
অনুবাদ: ওষধি (অর্থাৎ যে গাছের ফল পাকার পর গাছটি মরে যায়), ছাগল প্রভৃতি পশু, যূপ প্রভৃতি নির্মাণের যোগ্য বৃক্ষসমূহ, তির্যক প্রাণী (অর্থাৎ সেই সব পশু-পাখি, যারা তখনই পশু-পাখি রূপে গণ্য হবে যদি সেগুলি যজ্ঞীয় হবিদ্রব্যরূপে বেদবচন-বারা বিহিত হয়। যেমন কপিঞ্জল নামক পাখি), এবং চাতক প্রভৃতি পার্থী-এরা যজ্ঞের জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে আবার উচ্চযোনি লাভ করে।
বেদের মন্ত্র ভাগ বিধি নয় কিন্তু প্রার্থনাসূচক বাক্য রয়েছে তাই মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ থেকে দেখে নেওয়া যাক -
ন বা উ এতন্দ্রিয়সে ন রিষ্যসি
দেবাঁ ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ।
যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযু
স্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু।।
(শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা - মাধ্যন্দিন শাখা - ২৩/১৬ <উবট ভাষ্য>)
অনুবাদ - হে অশ্ব ! তোমাকে এই যজ্ঞে আমরা সংজ্ঞপন করিতে উদ্যত হইয়াছি কিন্তু ইহাতে তোমার মৃত্যু হইবে না অর্থাৎ বিনাশ হইবে না। বরং তোমার দেবলোক গমনের জন্য ইহাই সুন্দর পথ; যে স্থানে কত কষ্টে নানাবিধ পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তৎফলে সুকৃতিগণ গমন করেন, তুমি যযু নাম ধারণ করিয়া এই উপায়ে অতি সহজেই তথা যাইতে সমর্থ হইবে, সবিতা দেবতা তোমাকে তথায় সাদরে গ্রহণ করিবেন।
কিছু সংখ্যক লোকজন এসে বলবেন যে, স্বর্গে/দেবলোকে যাওয়ার জন্য মানুষকে ধরে বলি দিলেই তো হয়! তাদেরকে উত্তর প্রদানের নিমিত্ত বলবো - স্বর্গে যাওয়া সনাতন ধর্ম অনুযায়ী চূড়ান্ত নয়, এই বিষয়টি সকলেই জানেন। সনাতন ধর্মের মূল লক্ষ্য মোক্ষ লাভ, মোক্ষ লাভের জন্য সক্ষমতা মানুষের মধ্যে রয়েছে। তথাপি যারা ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ করেন, অপরাধী এইরকম মানুষদের কলি পূর্ববর্তী যুগগুলোতে বলি দেওয়ার বিধান ছিলো। এইরকম বিধানের কারণ এই প্রবন্ধের পূর্বের অংশ গুলোতেই সুন্দর করে বর্ণিত হয়েছে তথাপি পুনবিবৃতি করছি - অপরাধীকে যজ্ঞে বা দেব দেবীর সম্মুখে বলি দেওয়া হলে সে নতুন দেহ ধারণ করবে এবং ভালো কর্ম করার সুযোগ পাবে যেমনটা পশুরাও পেয়ে থাকে।
এই প্রবন্ধে পশুবলি নিয়ে বিস্তারিত লেখা হয় নি, কিছু সংশয় শাস্ত্রীয়ভাবে নিরসন করা হয়েছে মাত্র। পশুবলি নিয়ে বিস্তারিত অন্য কোনো লেখায় বর্ণনা করা হবে। যারা কালিকা পুরাণ উপপুরাণ বিধায় মান্য করেন না তাদের জন্য স্মৃতি, শ্রুতি থেকে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, যেহেতু কালী পূজা ও দেবী শক্তি'র অধিকাংশ রূপের পূজা শাক্ত মতেই করতে হয় তাই শাক্ত শাস্ত্রকে আপনারা না চাইলেও সনাতনীদের গুরুত্ব দিতেই হবে।
জয় সনাতন 🙏

আগমনী

ব
অরনী দেবনাথ

কাশের গুচ্ছ, মেঘের ভেলা দেখা যাচ্ছে আজ শরতে
দুর্গতিনাশিনী মায়ের আগমন হবে আবার এই ধরণীতে
পুত্র কন্যা নিয়ে মা আমার কদিন থাকবেন আনন্দেতে।

শঙ্খ বাজাও, কাঁসর বাজাও, ঢাকে ফেলো কাঠি
মাকে সবাই বরণ করো মেনে সকল শাস্ত্র নীতি
সঙ্গে আছেন লক্ষী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী
ভোলা বাবাও আছেন সাথে, কলা বউও সাথী।



ষষ্ঠীতে মায়ের বরণ হবে, হবে ঘট স্থাপন
সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী হবে নানান আয়োজন
দশমীতে সিঁদুর খেলার পরে মায়ের বিসর্জন।

মা যে আমার দশভুজা, জ্ঞান ও শান্তি প্রদায়িনী
সন্তানকে আগলে রাখেন তিনি, স্নেহময়ী জননী।

চাই না মাগো জাগতিক কিছু তোমার চরণ বিনে
শান্ত হোক এ ধরা তব পূণ্য লগনে তোমার আগমনে।



কবিতা - কলাম

মা দূর্গা

নিরঞ্জন দাশ

পূজো পূজো গন্ধ নিয়ে নতুন কবিতার ছন্দ নিয়ে এলো যে মা,তুমি যে মা
আমার মা, সবার মা দুর্গা মা।

তুমি কৈলাস ছেড়ে আসো যে আমাদের তরে,
তুমি মনের অন্ধকার দূর করে দাও চিরতরে।

দশ হাতে অস্ত্র নিয়ে হয়েছো তুমি দশভূজা,
আর্শীবাদ করো মা মুছে যাক আমার সকল পাপের বোঝা।

অসুর দমন করার জন্য করো ধারন তুমি রণচণ্ডী,
সেই তুমিই মাতৃস্নেহে ছেলের ভালবাসার কাছে হয়ে যাও বন্দি।





কালী হয়ে রক্তজবা গ্রহণ করে বাড়িয়ে রক্তজবার ফুলের শোভা,
তাইতো বলি তুমি যে মা আমার মা সবার মা দুর্গা মা।

তুমি যে ধর্মকে রক্ষার জন্য হয়েছো দুর্গেতেনাশিনী,
আমায় তুমি পথ দেখিয়ো যদি হয়ে যায় বিপথগামীনি।

সবশেষে প্রণাম জানিয়ে শেষ করি আমার এই ছন্দ,
আর্শীবাদ করো আমায় যাতে ধর্মের পথ থেকে না হয় ধর্মান্ধ।

তুমি যে মা আমার মা সবার মা দুর্গা মা,
জয় জয় মা দুর্গা মা, দুর্গা মা জয় জয় মা।

সংস্কৃত সহজপাঠ – দৈনিক প্রয়োগে উপযোগী শব্দ ও বাক্য

সংস্কৃত শব্দ	সংস্কৃত বাক্য
अंबु (অম্বু) - জল	**गृहे एकं पुस्तकमस्ति**
उदर्कः (উদর্কঃ) - পরিণতি	গৃহে একং পুস্তকমস্তি
कपिश (কপিশ) - বানর অধিপতি	বাড়িতে একটি বই আছে
नुति (নুতি) - স্তব/প্রশংসা	**सत्यं धर्मस्य मूलम्**
नृप (নৃপ) - রাজা	সত্যং ধর্মস্য মূলম্
चन्द्रिका (চন্দ্রিকা) - চাঁদের আলো	সত্য ধর্মের মূল
प्रेष्य (প্রেষ্য) - প্রেরণযোগ্য বস্তু বা ব্যক্তি	
कश्चित् (কশ্চিত্) - কেউ একজন	**विद्या मित्रं चरति**
सुस्वर (সুস্বর) - সুমধুর ধ্বনি	বিদ্যা মিত্রং চরতিঃ
तण्डुल (তণ্ডুল) - চাল	জ্ঞান বন্ধুর মতো সঙ্গ দেয়

SCAN NOW

কোর্স করতে QR কোড স্ক্যান করুন বা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন...

চিত্রাঙ্কন কলাম



অঙ্কনে: স্নেহা গাইন



"প্রশ্নোত্তর পর্ব: আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর"

প্রশ্ন - ১: অন্য ধর্মাবলম্বীরা (মতবাদীরা) তাঁদের ঈশ্বরকে উপাসনা করতে পারে মূর্তি ছাড়াই এবং করেও থাকে। তো আপনাদের কেন "পরমাত্মার" উপাসনা করতে পাথর, মাটির মূর্তির প্রয়োজন হয়? আপনাদের কি তাদের মতো জ্ঞান, বুদ্ধি নেই- সোজা পরমাত্মার উপাসনা করার মতো? (অনার্য <স্বঘোষিত আর্য> সমাজ কৃত প্রশ্ন)

উত্তর: শ্রুতি বলেছে - ব্রহ্ম সর্বত্রই থাকে। পাথর মাটি কাঠ ইত্যাদি অবয়ব মাত্র, এগুলো যে ব্রহ্ম নয় কিন্তু এগুলোতে ব্রহ্ম আছে (যেহেতু ব্রহ্ম সর্বত্র আছেন) সেটা ব্রহ্মসূত্র ৪/১/৫ সূত্রও বলে। মূলত অবয়ব একটি প্রতীক। অন্য মতালম্বীরাও দিক, শব্দ ইত্যাদি প্রতীক অবলম্বন করে থাকে। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় মৈত্রায়নী উপনিষদ ৬/২২ এ শব্দ ব্রহ্ম নিয়ে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু শব্দ ইত্যাদি পরম ব্রহ্ম নয় বিধায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬/৪৪ এর শঙ্কর ভাষ্য ও শ্রীধর টীকায় শব্দ ব্রহ্মকে অতিক্রম করে পরম ব্রহ্মে পৌঁছানোর বিষয় রয়েছে। তাছাড়া প্রশ্নকারীর হয়তো জানা নেই সকলেই (ধর্ম/মতের অনুসারী) উপাসনালয়কে অবলম্বন করেই উপাসনা করে; উপাসনালয়ও কিন্তু প্রতীক। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই অবলম্বনরূপ উপাসনাই স্বীকৃত। আমাদের প্রতিমা তৈরি থেকে শুরু করে উপাসনা (বিসর্জন আদি সকল ক্রিয়া) সবকিছুতেই প্রকৃতির পঞ্চ মহাভূতের ব্যবহার করা হয়। এই পঞ্চ মহাভূত দ্বারাই প্রকৃতির সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে; এগুলো সবই ঈশ্বরের প্রকাশ। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের উপর আমাদের ব্যবহারিক জীবন নির্ভরশীল বিধায় ঈশ্বরের মায়াময় প্রকৃতি রূপের প্রকাশের প্রতি পূজার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। তাছাড়া শ্রুতি বারবারই বলেছে মায়া যুক্ত হয়ে ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্ম তথা সাকার হন কারণ নির্গুণ থেকে সরাসরি সৃষ্টির প্রয়োজনীয় অন্যান্য গুণের সৃষ্টি হয় না। ব্রহ্মের শক্তি মায়ার দ্বারাই গুণ ও সাকার ঈশ্বরের প্রকাশ হয় (মায়া সম্পর্কটি বিস্তারিত প্রথম লেখায় রয়েছে)।

প্রশ্ন - ২: জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক কি দ্বৈত নাকি অদ্বৈত?

উত্তর: মূলত অদ্বৈত বিষয়টাই তাত্ত্বিক। আর তাত্ত্বিকভাবে আত্মাই মূল, জীবাত্মাই হোক বা পরমাত্মা মূলত সবই এক আত্মা তথা ব্রহ্মকেই বুঝাচ্ছে। শ্রুতির 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের একত্বই সিদ্ধ হয়। অষ্টাবক্র ঋষি বলেছেন - 'ভ্রমবশতই আত্মা সংসারী জীবের ন্যায় প্রতিভাত হন। কিন্তু বস্তুতঃ আত্মা সংসারী নহেন, কারণ আত্মা স্বভাবতই সাক্ষী, বিভূ (যা হতে বিবিধ বস্তু উৎপন্ন হয়), পূর্ণ, এক, মুক্ত, চিদ্রূপ (স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ), অক্রিয়, অসঙ্গ, নিঃস্পৃহ (বিষয়াদি অভিলাষ রহিত) ও শান্তস্বরূপ।' (অষ্টাবক্র গীতা - ১/১২)
দ্বৈত শুধু ব্যবহারিকভাবেই সিদ্ধ কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে অদ্বৈতই সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবাদে ব্যবহারিক উপাসনায় দ্বৈততা স্বীকার করা হয় অর্থাৎ, জীব ব্রহ্ম ব্যাবহারিকভাবেই দ্বৈত বা আলাদা কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে অদ্বৈতই। (আত্মা বিষয়ক বিস্তারিত লেখা ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় রয়েছে)।

প্রশ্ন - ৩: ঈশ্বর সাকার হলে সর্বব্যাপী হন কি করে?

উত্তর: ঈশ্বরকে সনাতন শাস্ত্রে শুধু সাকার বলা হয় নি, সাকার ও নিরাকার উভয়ই বলা হচ্ছে। বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদে ঈশ্বরের উভয় রূপের বিষয়েই রয়েছে। অথর্ববেদীয় প্রশ্ন উপনিষদ ৪/১০ অনুযায়ী - ব্রহ্মকে স্থূলসূক্ষ্মশরীর রহিত, গুণহীন বলা হয়েছে অর্থাৎ নিরাকার বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। আবার কৃষ্ণ যজুর্বেদোক্ত কঠ উপনিষদ, ২/২/৯ অনুযায়ী - 'সকল জীবের মধ্যে বিরাজমান পরমব্রহ্ম একক হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন।' এখানে যদিও স্ববিরোধ হচ্ছে না তথাপি যদি মনে হয় স্ববিরোধ হচ্ছে তবে মনু স্মৃতির সমাধান দেখুন - 'যেখানে দুটি শ্রুতি বচনের মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ উপদেশ আছে, সেরকম স্থানে দুটিকেই ধর্ম ব'লে গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ দুটিরই বিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে।' (২/১৪, খণ্ডাংশ); এমনকি ব্রহ্মসূত্র ৩/২/১৫ অনুযায়ী - 'শাস্ত্রে যে ব্রহ্মের সাকারভাবের উপদেশ আছে তাহা নিরর্থক নহে। নিরাকার আলোক যেমন সাকার বস্তুর সান্নিধ্যে আসিয়া আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মও উপাধিযুক্ত জীবের সান্নিধ্যে আসিয়া সাকার হন।'
অর্থাৎ, ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার একইসাথে সেটাই শাস্ত্র সিদ্ধ হয়।

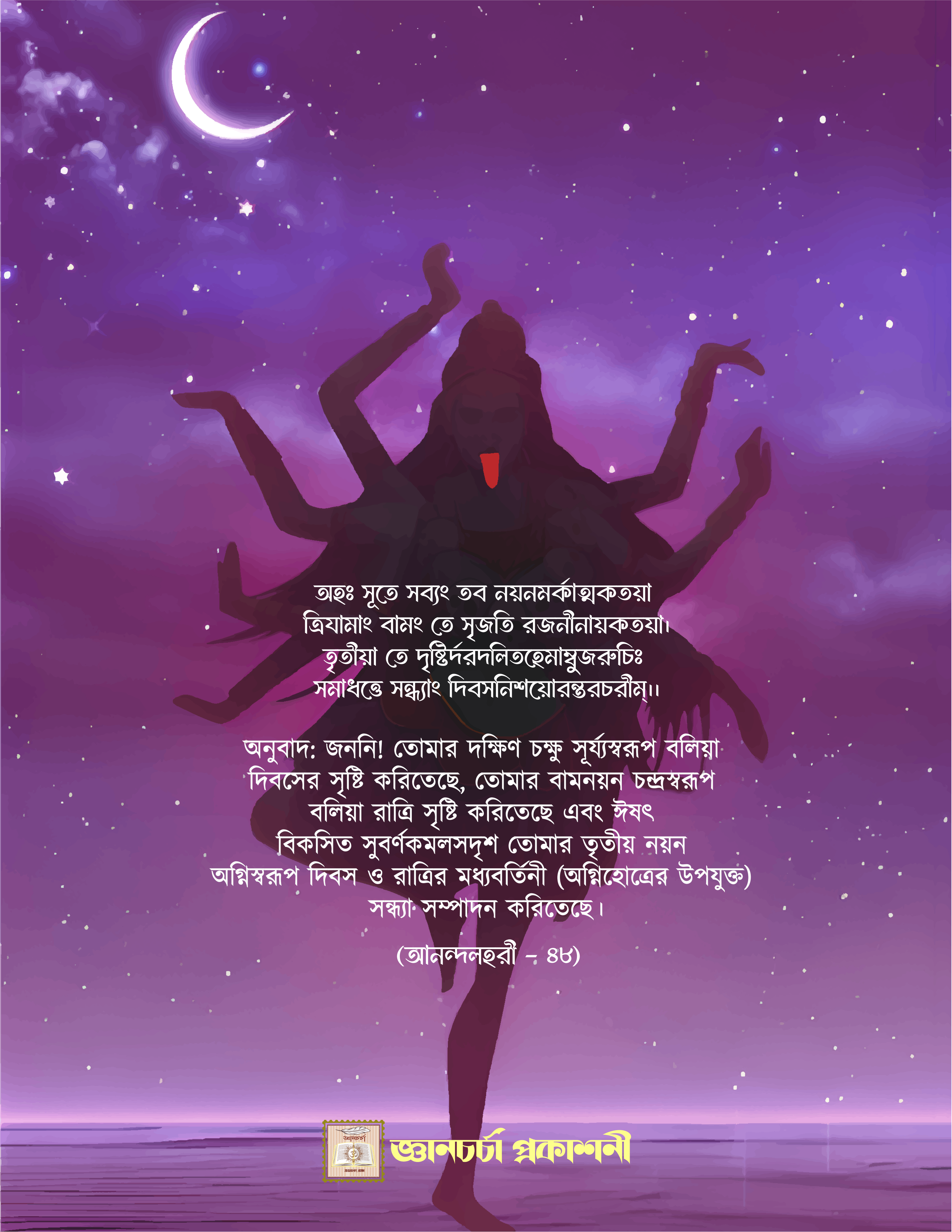
আপনার প্রশ্ন পাঠাতে অনুসরণ করুন অথবা **স্ক্যান করুন**

To: shashwata.satya@gmail.com

Subject: প্রশ্নোত্তর পর্ব

Compose email
প্রশ্ন - ....?
নাম - (বাংলায় আপনার নাম লিখবেন)
ঠিকানা - (উপজেলা, জেলা ও বিভাগের নাম লিখবেন)

Scan



অহঃ সূতে সব্যং তব নয়নমর্কাত্মকতয়া
ত্রিযামাং বামং তে সৃজতি রজনীনায়কতয়া।
তৃতীয়া তে দৃষ্টির্দরদলিতহেমাম্বুজরুচিঃ
সমাধত্তে সন্ধ্যাং দিবসনিশয়োরন্তরচরীম্।।

অনুবাদ: জননি! তোমার দক্ষিণ চক্ষু সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া দিবসের সৃষ্টি করিতেছে, তোমার বামনয়ন চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া রাত্রি সৃষ্টি করিতেছে এবং ঈষৎ বিকসিত সুবর্ণকমলসদৃশ তোমার তৃতীয় নয়ন অগ্নিস্বরূপ দিবস ও রাত্রির মধ্যবর্তিনী (অগ্নিহোত্রের উপযুক্ত) সন্ধ্যা সম্পাদন করিতেছে।

(আনন্দলহরী - ৪৮)

জ্ঞানচর্চা প্রকাশনী